জর্ণাল

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬১

প্রকাশক : সীমন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ শিল্পী : মণীন্দ্র মিত্র

মুদ্রক : ব্রজদুলাল সেন

নব মুদ্রণ লিঃ,

১৭০এ, আপার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা-৪

জর্নাল

●

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

●

কাহিনী
প্রকাশক
১৩১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

এক মুঠো পবিত্রতার জন্য

রুমিকে

স্যানাটোরিয়ম

জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিস-বাড়ীর সিঁড়িটা দিয়ে সে কতবার উঠেছে আর নেমেছে। সেই অফিসে তার কবিবন্ধু আছেন, তাকে দেখে ফিরেছিল। লাডক পাহাড়ের যে বৌদ্ধ বিহারটির ছবি সেই সিঁড়ির একপাশে টাঙানো ছিল, তারই শান্ত আলো তার হৃদয়ে। এই ভিড় থেকে অনেক দূরে—যুদ্ধ নয়, ক্ষমতা নয়, রাজনীতির কুটিল তর্কসিদ্ধির অবিরাম বিভ্রান্তি আর নয়। একদিন অমুরূপ বিশ্বাস করেছিল সে।

আর এক সিঁড়ি—এত পরিচ্ছন্ন আর ঝকঝকে, রুগ্ন শিথিল পদক্ষেপে কবুতর-সন্ধ্যের সলজ্জ মিনতি জেগে থাকে। অবাক। হাসপাতালের ঘণ্টা বাজছে, আর বাজছে। নির্জন। যারা তাকে দেখতে এসেছিল, তারা তার কেউ নয়। নীল নক্ষত্রের আলো পৌঁছুল। বহুদূর কালহীন সময়ের কিছু হাওয়া দেয়। আর তারা, যাদের সে দেখেছিল, যাদের কবরে মল্লির শুভ্র ব্যথা অতীতের মোহানায় সমুদ্রযাত্রা করেছে, তারা যেন হঠাৎ এল অতি স্থির অটলপ্রতিজ্ঞ। সেইসব প্রিয় মুখ ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলে। আজও তাদের কথা মনে পড়ে। দেহে তার বিপন্ন স্বাস্থ্য, অস্থিত যৌবনের প্রৌঢ় পীড়া, বিকেলের হ্রদের টলমল আলো তার চোখে, আর মুখে মৃত্যুর শান্ত দয়াময়তা।

তখনি এল সেই মেয়ে—সাদা এপ্রনে শাড়ি ঢাকা পড়েছে, সাদা ফিতে তার কাল খোঁপায়। শিলং-পাহাড়-গাঁয়ের মেয়ে সে, স্মিত স্নেহের পল্লবিত হাত বাড়িয়ে দিল—'আর বাইরে নয়, এখন ভিতরে চল, ছেলে।'

পাখার শব্দ ঘরের সমস্ত নিঃশব্দকে কি ঢাকতে পারে ? এত মৌন ঠাণ্ডা ঠোঁট। কথা নেই, কথা বাঙালী মেয়ের দেহ ও মনের মত নিষিদ্ধ, নিবিড়। শুনেছে সে অনেক উচ্চগ্রাম কথা বলা। শুনেছে হরিভক্তির অন্ধকীর্তনে উচ্চগ্রাম দৈনন্দিন এই পৃথিবী যেন ভাঙা কাঁসরের কণ্ঠে কেবল অভাব বিমোচনের সরবতা, ক্লিষ্ম ক্লিষ্ম দেহের আবিল ক্ষুধায় ন্যুব্জপৃষ্ঠ দ্বন্দ্ব, স্ত্রীলোক রমণে রত রাত্রির তামসিক জিজীবিষা। আলোবায়ুহীন এই পুতি সংপৃক্তি আর ভাল লাগে না। সেইসব মুখ অসুন্দর পাশব চিহ্নে চিরাঙ্কিত। ভীষণ। বীভৎস।

এতটুকু দয়া কর--অধিকার নয়, এতটুকু দয়া কর। ভিক্ষা।

গ্র্যাণ্ডের নিচে সোনারপুরের ক্ষেত-খামারের মাটি-লাগা এক উদ্‌বাস্তু মা এসেছিল। ছোট শিশুটিকে সেখানে সে শুইয়েছে। বিদেশী ইয়াঙ্কির স্থূল দেহগুলি মত্তপ অহমিকায় বেবুশ্যে নারীর হাত ধরে চলে গেছে। পুলিসের সমস্ত উদ্যম অতঃপর সেই শিশুর আর উদ্‌বাস্তু মায়ের মালিন্য লাথি মেরে ঝেঁটিয়ে দিয়েছে পথ থেকে। রাজার পথে এত আপদ আর আস্পর্ধা কেন সইবে, বল ?

সাপের খোলস, ভাঙা গুগ্‌লি শুকনো পুকুরটার ধারে ধারে। শেওলা জমেছে। পানা কচুরির জঙ্গমে শকুনির পাখ্‌সাট, আর সব শিশুদের শবাহারে শিবার উল্লাস। সে দেশ ছেড়ে শহরে এসেছে।...

'আবার আপনি ঘামছেন—শরীরের উত্তাপ বেড়েছে। নিচু হয়ে সাদা টাওয়েলে তার মুখ মুছিয়ে দিলে—বুকের শুভ্র উন্নত ঘনতা তার নিঃশ্বাস ছুঁয়েছে। থার্মোমিটার জিহ্বার নিচ থেকে বের ক'রে নিলে; পিছন ফিরে চার্টে পেন্সিলে ঊর্ধ্ব আঁচড় কাটল।

'বোন, বলতে পার—আর কত দেরি ?'

'কিসের ?'

'মৃত্যুর ! অসহ্য এই অপেক্ষা—আশাবিমুখ বিরতিহীন এই অপেক্ষা !

'তুমি বোকা, পাগলা ছেলে !' মাথার চুলে সরু সরু আঙ্গুলগুলো তার বিলি কাটল। আর এক ঝলক হাসির উদ্ভাস মুখে। এ কোন মুখ—অপরিচিতা ?

সে এক পাগল, যাকে কেউ আমল দেয় না, বোঝে না, আপন ভাবে না। টুকরো টুকরো আমি, খণ্ড খণ্ড মৃত্যু যেমন রয়েছে আমাদের রোজকার জীবনে, অতীব সত্য হয়েও যেমন সেরূপ কারও চোখে ধরা পড়ে না, কোথায় যেন রয়েছে এক বিরাট না, আর না—, এ-ই অস্তিত্বে, স্বভাব-চৈতন্যে, দুঃখে-সুখে, অভাব-বিত্তে, শ্রমে-আলস্যে, রোগে-শোকে, জনন ও জন্মে সার্থকের অর্থ—চরিতার্থতার প্রসাদ পিঠ ফিরিয়ে আছে যদিও, তবু ওরা বলে, এই স্বার্থ—এই জীবন। বোঝে না, কিছুতেই বুঝতে পারে না। খামকা তারা কথা বলে। অস্তিত্বের অন্তঃসারে শূন্য শূন্য প্রলেপ।

এ কোন আকাশ আলো। সবুজ এতটুকু একমুঠো ঘাসে যা হতে পারে স্পর্ধিত, অন্ধ বন্ধ নয় চোখের আলো। অমিত আনন্দের সূর্যালোক-ঝরা সেদিনের দুয়ার কে আগলে রাখে ? তার ছাড়পত্র দেবে না, কিছুতেই দেবে না তাকে। তার মনের পাগল হারিয়ে ছড়িয়ে খুঁজেছে তা। আর একদিন শরতের বিকেলে শেফালি-ঝরা সিউড়ীর রাঙা মাটির পথে দেখেছিল শেষ বর্ষার চিকন দেহের নীল শাড়ি যেন ছিল তার পরনে। দিন শেষের অলাত আকাশে

তার দৃষ্টি। বলেছিল—দেখ, দেখ। এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত। মানস সরোবরে চলেছে ওরা।

এক যুদ্ধ শেষে বরফের ঠাণ্ডা স্নায়ুহীন অবিমৃষ্য এবড়ো-খেবড়ো দিনে যারা জন্মেছিল, সে তাদেরই একজন। সেইসব দিনের শীতের নির্মম প্রহারেও যারা মেরুদণ্ডে মানবিক উত্তাপকে উৎসারিত হতে দেয় নি, সেই ক্রান্তিলগ্নের এক অপরূপ স্নেহমুখ অসংখ্য মানুষের শোষণ-তাপ-জরার-দুঃখাবসানের অসম্ভব স্বপ্নের রূপকথায় দূর নক্ষত্রের আলোর আহ্বান জানিয়েছিল যাঁদের, যাঁরা বার্সিলোনায় গিয়েছিলেন, স্পেনের ক্রুসেডে—মানবিকতার সেইসব প্রণম্য পূজারীদের নামের সঙ্গে নিজেদের কথাও জড়িয়ে গিয়েছিল। ও হাওয়া পাগল হাওয়া, তার গন্ধ জড়িয়ে আছে স্মৃতিতে। তার ভাবনা, তার কথায়—নবযুগ আনবার স্বপ্নে নিশি ভোর হত।

তাঁদেরই সৃষ্ট পথের প্রাগ্রসরতায় আশ্চর্য স্তালিনের দেশ থেকে সুদূর ক'লকাতার রাজপথে মিছিলের অসংখ্য চোখের আলো এ যুগের মহাকাব্যের জিজ্ঞাসায় অতিশ্রুতির প্রত্যাশায় সন্ধ্যার রক্তরাগ ধূসরে আকাশবাণীর মত কথা কয়েছে!

তারপর আরও একটা যুদ্ধ গেছে। আর্তির ডমরু বেজেছে অকথিত রক্তস্নানে। তখনও কয়েদখানার দিনের অন্ধ এখানে স্বাধীনতা যাচ্ঞা করেছে। আলো আর আলো। তারাও বিশ্বাস করেছিল, সমাজের একটি মানুষও যদি ভাত-কাপড়ের অভাবে পীড়িত হয় তো সেটা পাপ। মনুষ্যত্বের অমানুষিক অবমাননায় ক্ষুব্ধ হয়েছে, সমাজকৃত পন্থার শ্বাপদ অরণ্যে সমুত্থিত নাগিনীর ফণা তাদের গায়ে বিষ ঢেলে দিয়েছে। তবুও—তবুও পথচলার বিরাম নেই। আজ অধ্যাত্মভ্রূত স্বাধীনতার উল্লাস সহস্র হায়েনার নিশীথে রক্তসঙ্কুল।

বাতাসে কিসের কান্না—হায় রে! বিরাট আশাভঙ্গের নিরাশ্বাসের হাসি হেসে দিন কাটে—হায় রে!

আলো নিভছে স্যানাটোরিয়ামে। মশারি টেনে দিতে এল সেই মেয়ে।

'আপন মনেই হাসছ?'

'ভাবছি, এই কি স্বাধীনতা?'

'ভুলে যেওনা তুমি অসুস্থ। তবু এত নিরাশ ভাবনার কি আছে, বোকা ছেলে?' আদর ক'রে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে সে।

তার চলে যাওয়ার নিঃশব্দ পদক্ষেপ উৎকর্ণ হয়ে শুনলে। কে যায়—কে? কে আসে?

শুধু স্বাধীনতাই কি কেবল আমরা চাই, আর কিছু না?

মহাভারতের বিভা বসু আর সুপ্রতীকের কোন্দল-কাহিনীর মত সব দেশ—আমাদের দ্বিখণ্ডিত দেশ। সুপ্রতীক বলেছিল, ধনবণ্টন ক'রে দাও। বিভা বসু বললে, শাস্ত্রহীন, গুরুহীন তুমি, লোভী। একজন বললে, তুমি হাতী হও—আর একজন বললে, তুমি কচ্ছপ!

এবার জোরে জোরে হেসে উঠল সে। কি অদ্ভুত অভিশাপ—হো হো।

আবার সেই মেয়ে দৌড়ে এল। মাথায় অডিকোলনের পটি দিলে, শাসন করলে।

'এখনও যদি ঘুমিয়ে না পড়, তবে ঘুমের ইন্‌জেক্‌শন দেওয়াই হবে আমার কাজ।'

'তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, আমাকে আর একটু জেগে থাকতে দাও।'

এখন কত রাত! বেদনায় নীল হয়ে আছে কি আকাশ! তারার

মৌন অনুনাদে রাত্রির ঠোঁট কি কাঁপছে! এখানে এক সিঁড়ি—আর এক সিঁড়ি। এটা ময়লা গলি। ওখানে দুখুর মা থাকে, আর দুলালী, আশা, নীলা, চায়ের দোকানের সেই হ্যালা-খ্যাপা মানুষটা—এক কাপ চা খাওয়ালে ভাগ্যফল বলে দেয়, শালপাতায় চানাচুর দিয়ে যায়, এক বোতল দিশি মদ!

এক সিঁড়ি, দু সিঁড়ি। আস্তে বন্ধু, আস্তে। দেখছ না এটা গৃহস্থ বাড়ি! মরণ আর কি! সিঁড়ি আর সিঁড়ি।

—জান-না, সে মরে গেছে?

আঃ, কি স্নেহ মায়ের মত বক্ষের শান্তি! সমস্ত শুভ্র বুক পেতে নিলে ক্লান্তির কালিমা। —ভয়, কিসের ভয়, ভয় হয়! আমার সোনামণি জ্বালা জুড়োতে এসেছ। দেখ, দেখ!

এই স্বাধীনতার ভয়।

এ কোন নারী করুণাময় মিনতি নিয়ে নিজেকে অবারিত ক'রে দিলে। এত উন্মুক্ত অবাধ দেহের ক্ষমা নিয়ে আরতি জানালে। সমস্ত অরাতিকালের ক্ষণিক বিভঙ্গ সেই রাত্রির মিশমিশ কাল চুলে চুমিয়ে রয়েছে। না, ঘৃণাও নয়, ভয় নয়। এই স্বাধীনতাটুকু লাল-আলো-জ্বালা পথের মানায় লাল পাগড়ির মৃদু লাঠির আড়ালে এক যৌনবিকারের কুৎসিত কলুষে আকণ্ঠ ডুবে আছে। আর তার এক ছেলে দেওয়ালে লিখে রেখেছে—তোমার সঙ্গে আর ঝগড়া করব না।

তোমার দেহে আমার দেহের জ্বালা ঢেলে দিয়েছি, আমার গ্লানি-ক্লেদ-বিকার-অন্ধকার তোমার যোনির অন্ধকারে লীন হয়ে নিজেকে ফুরিয়ে জুড়োতে চেয়েছি। না, আর না। আমার ক্ষুধা ভাত-কাপড়ের টানাপোড়েনে প্রাণান্ত, তবুও নয়—সব মিটে গেলেও নয়। এদেশে ভয়; ওদেশে ভয়। এখানে মানা। ওখানে। এখানে

সূর্যাস্ত হলে অন্য দিনের সূর্য আর ফেরে না। ফিরবে না, আর ফিরবে না। তার মৃত্যু হয়েছে। এক বিরাট অস্তিত্বের অভাবে থর্‌থর্ করেছে মানুষের হৃদয়। এই মহান মৃত্যু পরিপূর্ণ সূর্যালোক-ঝরা দিনাবসানের মত। ঝড়ের শেষে, ঝড়ের শেষ মৌনে মহীরুহের প্রতীক্ষায় অটল। তার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করেছি। তার কবরে শুভ্র মল্লির নীরব কান্নাকে থুয়ে এসেছি।

'বসে আছ কেন, এত রাতেও ঘুমোলে না ?'

'বোন, সিড়ি দিয়ে অনেক লোককে যাতায়াত করতে দেখলুম।'

'অধ্যাপক রায় মারা গেছেন। তথাগত তাঁকে শান্তি দিন। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি ! অবাধ্য হয়ো না।'

'রায়, যিনি দর্শনের অধ্যাপক—আট নম্বর ঘরে ছিলেন ? কি জান, বোন—আমিও ফিরব না, আর কোনও দিন না। একটু বসবে ! তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব।

'বল। কিন্তু কথা বলা তো তোমার মানা।'

আর্ট স্কুলে গিয়েছ কখনও ম্যুজিয়মের পিছনে আর্ট স্কুলে ? পুকুরের স্থির জলে দুপুরের চৌকো-চৌকো রোদ্দুর এসে পড়েছিল। আর কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ ছিল বাতাসে। কাঠবিড়ালিরা এসেছিল সেইখানে, তার সাদাশাড়ির আচল ছুঁয়েছিল। অনির্বচ এক কৌতুক-উল্লাসে সে তুলি নিয়ে ঘাড় ফিরিয়েছে। খোঁপা আল্‌গা হয়ে পড়েছিল পিঠে। জিওলজিক্যালে আমার কবিবন্ধু আছেন। তিনি বলেছেন, সাদা শাড়িতে ওকে যেমনটি মানায়, অন্য কিছুতে তেমনটি নয়। প্রশ্ন করেছিল, চেন নাকি ? চিনি নে আবার ! ও আমার চোখের ছবি যে ! গাছের ছায়া পড়েছে, ঝির্‌ঝির্ ক'রে পাতায়

হাওয়ার কাঁপন জেগেছে, আমি যে গানের সুর শুনে বসে আছি! কিন্তু বোন, আমার যে আর সময় নেই!'

'তুমি তাকে ভালবেসেছ? কেমন দেখতে সে—তোমার বাঙালী ঘরের মেয়ে?'

'না, না। কোন দেশ দিয়ে তার জাতিকরণ হয় না, কোনও সময় দিয়ে নয়। আর তার ক্যান্‌ভ্যাসে তুলির আঁচড়ে এক ছবি জেগে উঠেছিল। নীল রেখা সে ছবির—মানুষের যন্ত্রণায় শাশ্বত—যুগান্তের দর্শনে অন্বিষ্ট, বিভ্রান্ত—আবর্তিত চক্রের এক প্রান্ত অন্য প্রান্তকে যেমন টানে। ভাঙাচোরা কালজ্ঞ কিছুর প্রতিভাস তার চোখে, আর তার তুলি বিরামবিহীন······

'সে ছবি আঁকে? তোমাকে ভালবাসে? তুমি ভালবাস তাকে?'

'যে সুন্দর, তাকে ভালবাসতে সকলের সাধ। আর যে মন সুন্দরকে রচনা করে, তার প্রতি আমার তদধিক লোভ। কিন্তু বোন, তুমিও আমার স্বল্পকালের স্বাধীনতাকে অপহরণ করছ কেন, কেন কেবলই পাহারা দেবে, কেবলই শাসন করবে! আমার মনে হয়, তুমিও কত ভাল! তোমাকে চিরকাল মনে রাখব।'

'কেন তুমি পাগলের মত এত কথা বল, বুঝি না। হাত তোল। হ্যাঁ, এই তো লক্ষ্মী ছেলে। ইন্‌জেক্‌শন না করলে তুমি যে ঘুমোও না!'

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে চারটে বাজল।

'ডাঃ রায়কে কোনদিক দিয়ে নিয়ে গেল, বোন?'

'জানি না। ঘুমোও।'

নিঃশব্দ শূন্য শূন্য প্রলেপে নিরবলম্ব অন্ধকার। পূব আকাশ

ফাঁকা হয়ে এল। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসের তার কবিবন্ধু একরাশ রজনীগন্ধা নিয়ে এল, রাখল মৃতের শিয়রে।

'বোন, কখন সে মারা গেছে?'

'শেষ রাতে। কিন্তু একজনের কথা সে এত বলল, সে তো এল না! তাকে খবর দিও।'

স্যানাটোরিয়মের সিঁড়িতে ঝাড়ু পড়েছে। সেখান দিয়ে তিনি নেমে গেলেন। ওর কাজের ঘণ্টা ফুরিয়েছে।

'বোন!' দৌড়ে এল কবিবন্ধু।—'কে সে, বললে না!'

'তুমি জান-না, ম্যুজিয়েমের পেছনে এক মেয়ে, যে ছবি আঁকে?'

'ওঃ—হ্যাঁ!'

বিষণ্ণ মুখে কি যেন মনে করল একবার। তারপর মাথা নিচু ক'রে নেমে গেল সে।

কবর

একদিন মৃন্ময় মিত্রের মত রঙীন চশমা দিয়ে দেখা আকাশ আলো হাওয়ার পৃথিবীটা আমারও চোখে পড়ত। আয়নায় একটি সুখের প্রসাদের মতন, আয়নায় যে মন একলা দেখে তেমনি সংসারের কতশত ভীড়ের মধ্যে সেও ছিল আমার মনের আয়নায়।

প্রবাসী উদাসীর মত নাসিকা জুড়ে কনকচাঁপার বিলাস ছিল যার আর তার জৌনপুরী বিরহাপ্লুত কান—সেইসব সৌরভ, স্মৃতি গান, কেমন করে আমার মধ্যে একদা বেঁচেছিল তা ওকে না দেখলে মনে করারও কৈফিয়ত জুটতনা।

দূর প্রান্তরের এক রাখাল তার মোহন বাঁশী নিয়ে একলা অনেক দূরে হেঁটে চলেছিল—আমাদের আশ্চর্য অনেক অনেক ভোর বেলাকার আলোর গল্পের মত। একদিন তাকে দেখলাম—লখ্‌নৌর লাল সড়কে ডোরাকাটা নীল শার্ট আর মাখন রঙের ট্রাউসার পরা ঝাঁকড়া চুল ফেরান সে ধারাল চোখ নীল কাঁচের মধ্যে উজ্জ্বল রেখে মস্ত এক ফটক বাড়ীর সামনে কান্নায় স্থির হয়ে আছে। সেই তার কৈশোর উজ্জ্বল ভোরের আলো করা সরোবর। রূপকথার মত দুরন্ত এক মেয়েকে সে দেখেছিল সেখানে; গীর্জ্জার চূড়ো থেকে ঘোরান এক সিঁড়ি নেমে এসেছিল যেন সেই আকাশ বাড়ীটার—সেই বাড়ীর ছোট্ট মেয়েটি মৃন্ময়ের মনে আলোর আলপনা এঁকে দিয়েছিল তার কৈশোরে। ফটকের ওপারে দীঘির টলমল জলে সমস্ত বেলা আলোর আয়নায় নীল শালুক রক্তপদ্মের উঁচু উঁচু মুখ দেখা যায়, দেখা যায় সেই মেয়ের দুখানি অলক্তক পা সবুজ ঘাসের উপর থর-

গোলাপের মত জেগে আছে—চলায় চঞ্চল, হাওয়ায় উড়ছে তার তমাল চুল, চোখে যেন ধনুকের বিস্রস্ত কান্তি। সে মুখ দেখলে মনে হত যেন যুগযুগান্ত ধরে সে তার সঙ্গে কথা বলেছে, যেন সে পৃথিবীর ছটা ঋতুর রওয়ানা রাস্তায় অনেক দূর হেঁটে বিদায় দিয়েছে তাকে—এমনি ভাবত।

তাদের বাগানে অনেক অনামা ফুলের বসতি, তারই পাশে লাল সুরকীর রাস্তা। গেট ঘরের কাছে ইয়া মস্ত মানুষ বসে থাকত—নাম ছিল তার রগনলাল। সে তাকে ভাবতো দরোয়ান। পশ্চিম দেশের মানুষ সে—লক্ষ্ণৌ থেকে গান শিখেছিল গুণী হাফেজ খানের কাছে। পদ্মপাপড়ীর মত লাল চোখ তার অদ্ভুত ভয় মেশান ছিল, এমনিতেই তাই ধারণা হয়েছিল মানুষটিকে এক জবরদস্ত পাহারাদার বলে। আর কতদিন সে দেখেছে সন্ধ্যায় যখন মালতী গন্ধ আর পাতাবাহারের বাতাস দোলান আলস্য এসে রগনলালের সিদ্ধিঘোঁটা চোখকে ক্লান্ত করত তখন সেই মানুষটিই কিনা আশ্চর্য জৌনপুরীর গভীরে ডুবে আছে!

একদিন সেই সুরেরই পথ ধরে সে চলে এসেছিল আর তখনই জানলে যে রগনলাল সুন্দর মানুষটা ভালই ছিল। আরো দূরে ছিল বাঘের মত আরও কটা কুকুর, সে সব কুকুরের ভয়ঙ্কর সুন্দর ছবি এঁকেছে সে বার বার তার শ্লেটে, আর মুছে দিয়েছে। কিন্তু সেই কুকুরগুলিকে এড়িয়ে যাবার সাহস ছিল না তার কোনদিনই।

তবু একদিন কাছে থেকে তাকে দেখলে,—দেখা হয়েছিল সেই মেয়ের সঙ্গে—সেই তার চোখে প্রথম রূপ—সোনার সিঁদুরে মুখ তার প্রতিমার, নীল অপরাজিতা চক্ষু পল্লবে দৃষ্টি মেলা সোণালী আঙ্গুরের মত আঁখিতারা তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

সে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেছিল,—তোমাদের অই কুকুরগুলো ভয় করেনা বুঝি ?

—ভয় পেওনা। বাঁধা আছে।—গেট বাড়ীর ওদিক থেকে গলে পড়ল সেই মোমের মত কণ্ঠস্বর। ডাকলে হাত বাড়িয়ে—এসনা, এস।

তবু কী যে কুণ্ঠা হল তার মনে, বললে—আমরা যে গরীব আর তুমি রাজবাড়ীর মেয়ে, তুমি লাল টুকটুকে ওটা কি পরেছ, সোনার জামা ?

—না, না এটা এমনি পশমের। উড়ন্ত এক ঝাঁক পায়রা যেন তার হাসি রোদে ঝিকমিক করে উঠল—সোনার আবার জামা হয় না কী ?

—সবাই বলে তুমি যে রাজকন্যে, তোমাকেই তো সোনার জামা সাজে, বা রে হাসছ যে—বলেছিল সে।

সেই বাড়ীর ভিতরে গেল সে, ফটক পেরিয়ে দীঘি, ওধারে বাগানের শুরু, ফুলের কেয়ারী করা পথ—সুরকীর সিঁদুরে যেন সদ্য বিয়ে হওয়া শ্যামলা মেয়ের চওড়া সিঁথি। জামের জামিরের উঁচুনিচু ঘনতা, সেখানে আমের অনেক কনক মুকুল, কিশোর আঙ্গুলের মত চাঁপার কমনীয়তা, বাদাম, মেহগিনি, একসার শিশুঝাউ, দাড়িম, কাঁঠাল—কত কত গাছের উপনিবেশ ছাড়িয়ে এসে পৌঁছুল যেখানে পাখীর ঘর সব সেখানে—পোষা ময়না, তিতির, ময়ুর, রাজহাঁস, হরিয়াল, ছাড়া পাওয়া হরিণ শিশু, গাছের কাঠবিড়ালীর চমকান নিস্তব্ধতা। আর আস্তাবলের কাল মখমলের মত মিশমিশে ঘোড়া ছিল সেখানে, অদ্ভুত লেগেছিল তাদের জজ্বার থরথর আলোর রৌদ্র বলয়—পড়ন্ত বেলার সোনা রোদ ছায়ার হাত ধরে নেমেছিল তখনই,

অদূরে গোহালে গাইগুলো হাম্বা রব করলে। কাছারী ঘরের এক ডজন ঘড়ি সুর করে সময় রাখছিল তখন, টুং টাং টুং টন্।

তারপর আরও কতদিন সে তার হাত ধরে বেড়ালে—আকাশে মেঘের রাজ্য ডিঙিয়ে নক্ষত্রদের মানিক জ্বলা কত দেশ তারা ঘুরে এল—সেই যে একদিন গেট বাড়ীর ভয় ডিঙিয়ে সে চলে এসেছিল তারপর।......

সেই থেকে মনে মনে একটা ছবি রেখেছিল এঁকে।

কি যেন নাম ছিল তার—রীতা, সে মেয়েকে বাঙালী ব'লনা, বিদেশীও নয় সে, পৃথিবীর সব দেশের সীমান্তে তার ঘর—রাখাল ছেলের বাঁশী শুনে যে উদাসী মেয়ে পথে পথে জন্মজন্মান্তর তাকেই খুঁজে বেড়ায়। সমস্তকালে সংসারের আর এক একলা বাউল সংসারের সব মানের বাইরে যে একলা শিশু আছে, সে তার হাতের মোহন বাঁশিটি সেই মেয়েকে দেবে বলেই পথ হাঁটে, আর তার পথ চলার শেষ হয় না,—কোনও কালেও না।

রীতা কী তেমনি মেয়ে ছিল? যার চোখে অগম অভিসারের আলো ছিল—রীতার কঠিন অসুখ হল। সাদা এপ্রন পরা মেম সাহেব তাকে গেলাস গেলাস কমলার রস খাওয়ালে, সাদা গ্লুকোসে গেলাসের কমলা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। জ্বরের উত্তাপ বাড়ল। সময়, —মুখ, মরশুমী ফুলের কেয়ারী সুরকীর রাস্তার বিকেলের ছায়া, জ্বরের উত্তাপের মত অসহায় আকাশ—আস্তাবলে বাঁধা ঘোড়ার পিঠের মত চমকাল। সিঁড়িতে তার কোমল পায়ের ত্বরা খরগোসের মত দুরন্ত হলনা। কেবল বিলাতী কেতায় ভারী জুতোর শব্দে স্টেথিস-কোপের মালা দোলান মুখ, সাদা বুকের সাবধানতায় বৈদ্যরা এল, গেল।

অন্ধকারে তার চুল আঁচড়ান সিঁথি সাদা হয়ে নীল ঘনতার ঘুমকে কপাল ছুঁয়ে রইল, দেখলে পৃথিবীর আলোকে অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে নিতে—সব রঙ সবুজ পাতার, নীল শান্ত স্রোত জল, নদীর—রক্ত গোলাপের পাঁপড়ী তার চোখের আলো—অন্ধ হল। হায় সেই ভোর বেলাকার চাঁপা যা ছিল তার নাসিকা জুড়ে, যার উজাড় সূর্যের দীপক গান তার শ্রবণে—অডিকলোনের ছোঁয়ায় মশারীর পাতলা চাঁদোয়ায় ঢেউ তুলেছিল তা দূর নক্ষত্রের আলোয় এক ভীরুতা, ওষুধের ঝাঁঝেলা স্বাদে তার মন তার বুকের নরম প্রদেশে এলোমেলা হয়ে এল—কোথায় হারাল সব শব্দ সব বোবা ভাবনা ?

মৃত্যু। ঝিঁঝির নীরব এক ঐকতানে—অন্ধকারে অশথের ঘনতায় বর্ষার মেঘভাঙা হঠাৎ আলোর কৃশ চাঁদে, দূর মন্দিরের ঘণ্টা শুনে রীতা হেঁটে চলে গেল।

রগনলাল স্থির পুরুষের প্রত্যয়ে তাই বললে তাকে, রীতা আছে সব ফুল ফোটান আলোয়, সেই কথায় আর একদিন জৌনপুরী সুরের অপার বিরহী তম্বুরার তারের স্বরে মুখ মিলিয়ে রইল। সেদিনও সে ভেবেছিল সে কি আর বাঁচবে, মাঠের শুকনো খড়ে মুখ গুঁজে সে কাঁদলে আর কাঁদলে, কদিন সে যেন সূর্যের মুখ দেখলেনা। ছেলে বেলায় সে অনেক হারিয়েছে, বাবাকে মরে যেতে দেখেছে, আরও কত অভাব দারিদ্র্য তাকে কত মেরেছে। কিন্তু এত বড় দুঃখ—এত বাবধির সেই অসাধ্য সুন্দরের মুখ সে আর কোনও দিন দেখবেনা যে সেই দুঃখে, তারই বিরহে সে যেন মরে গিয়েছিল।

দুই

অন্যদিনে তার অনেক কটা ডোরা কাটা শার্ট অদৃশ্য হল—সেই ছোট্ট মৃন্ময় মিত্রের আশ্চর্য গল্পের স্বাদ তবু যেন ফুরলনা। ওর চোখ সবুজ ঘন চশমায় ঢাকা পড়েছে তখন; ধারাল মুখে নিষ্ঠুর বসন্তের দাগ জেগে উঠল, একদিন ও দুরন্ত অসুখে ভুগেছে। লখণৌর স্কুলে ছবি আঁকছিল কিছুকাল—একদা জানলে পা দুটো বয়ঃসন্ধিতে কেমন যেন ভারী, ইজেলের মত ফ্রেম আঁটা অভ্যাস মসৃণ শ্লেটের মত মুছে মুছে অনেকটা কাল কাটিয়ে দিলে তবু।

ছবি আঁকলে, কালির আঁচড় কাটলে, রঙ বদলালে।

প্রজাপতি। সোনালী চীল। একটি ভিজে বাড়ী। ছায়ায় বর্শি বেঁধা চোখের আলোর তন্ময়তা—নীল বেদনার আলো অথচ সূর্য নেই। কয়লার খাদে ইঞ্জিনের ধোঁয়া। সন্ধ্যার নদী নেই আর হৃদয়ের অজস্র ঢেউ,—কিনা আঁকলে সে।

অনেক আর এক প্রথম তারা। শীত। বাঁশ ঝাড়ের খট্টাস। রাত্রির অপারেশন টেবিলের নিঃসঙ্গতা। পেঁচা।

অনেক দূরের ধানকাটা উঁচু নিচু মাথা—বাঁশের সাঁকো। কটি নৃত্যরতা সাঁওতালী মেয়ে আর মাদলের দ্রিমিক দ্রিম, মহুয়ার শ্বেত রক্তের অজস্রতা।

এমনি একদিনে ওর সঙ্গে অমিতার সখ্যতা—অমিতা'দি লখণৌয়ে থাকতেই অন্তরঙ্গতায় মৃন্ময়ের আপন হলেন।

আর একদিন প্রবাসীর ভালবাসা নিয়ে সে এল সহর কলকাতায়, সঙ্গে নিয়ে এল অদ্ভূত অভাব আর বিরহ। উঁচু মাথার লোকগুলিকে নিজের সঙ্গে মাপলে সে, দেখলে এক স্রোত, উপরে ভাসছে খড়কুটো, সেখানে আছে আকাশ ছোঁয়া চিমনির ধোঁয়া; সতত যন্ত্রের সঙ্গে চোখ মেলান স্থূল শরীর, রাস্তার বিদ্যুত, ট্রাম বাস রেস্তরাঁ বার দোকান ব্যবসায়—অপিস স্কুল কলেজ সব মিলে মিশে একতাল কাদা। একতাল কাদা—আর গঙ্গার গেরুয়া জল, ময়দানের ঝুলে পড়া অবার আকাশ, আর সেখানেই পক্ষান্তরে অলাত চাঁদের অবাক হৈ হৈ হাঁক!

একদিন আমাকে মৃন্ময় মিত্র বলেছিল—অমিতাদিকে যদি আমি বিয়ে করতুম তাহলে আর এমন কী তার জন্যে পাগল হ'তাম। —কৈশোরের ঘুম ভাঙা পবিত্র মুখের মত ভাবনার দৃষ্টি পাঁপড়ি মেলে দিলে। বললে—এই দেখ আমার মান্ধাতা আমলের ছেঁড়া জুতোটায় পেরেক উঠেছে, আমার নিঃস্ব পকেট ছিঁড়ে গিয়েছে, সেখানে প্রভূত রিফুকর্ম্ম, অথচ আমাকে ছাড়া অমিতার চলত না। বয়েসটুকুর বাধা ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও প্রাচীরই ছিল না, অমিতাদি আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, হয়তো উনি ছিলেন পঁচিশে আমি বিশ, কিংবা উনি আটাশ হলেও হতে পারেন সে সময়ে। অমন সুন্দর মুখ আর স্বাস্থ্য, অমন লম্বা ছাঁদ মেয়ে আমার চোখে পড়েনি, আর তার হলুদ রঙ, পিঙ্গল চোখ সব মিলিয়ে এক এমন সুন্দর সে —! আমাকে ছাড়া অমিতার চলত না, ওর বেহালায় নূতন সুর তোলার জন্যে স্বরলিপি আনতে আমিই যাই। ওর ব্লাউসের সবচেয়ে নূতন ডিসাইন আমি খুঁজে আনি; আমি বলে দেই ওকে কোন রঙের সাড়ীতে কখন কেমন মানায়, ওর খোঁপায় লাল ফুল দিলে বলি—রক্তকরবীর নন্দিনীকে মনে পড়ে। বলি—আশ্চর্য, ঈশ্বর তবু আমার গলায় বিশু পাগলের মত একটুও গান দেন নি, কি অনিয়ম! এসব কথা চূড়ান্ত মেনে নিয়ে অমিতাদি হাসত—বর্ষার স্রোতস্বিনীর এক গা ঢেউ জেগে উঠত তার সারা শরীরে।

অমিতাদিরও একদিন বিয়ে হ'ল। লোকে বলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ সবই প্রাক্তন, স্থির—কোনও খণ্ডন নেই সেই স্থিরতার! তাই মানলাম। তাই একদিন কলকাতায় এলাম। লখণৌর লাল ষ্টেশনে আমার চোখের আলোয় বসন্তের বিধুরা পটের মত জেগে রইল সে। নীল নীল আলোর ওপারে বাঁকা সাপের মত রেলের গতিপথে সন্ধানী চোখের মণি নিষ্ঠুর বিরহের চমৎকারিত্বে আশ্চর্য হয়ে

অন্ধকারে পথ বলে দিলে। হাওয়ায় তার একরাশ চুলের স্পর্শ উদভ্রান্ত সন্ধ্যার পিঠে আছড়ে পড়েছে, উজ্জ্বল তার সিঁথির সিন্দুর—বিকেলের আকাশ—থরথর ঠোঁট তার নক্ষত্রের নীল গল্পের মত।

ষ্টেশনে বিদায় দিতে এসে অমিতা'দি বলেছিল—অনেক বড় হও।

বলেছিলাম—এত বড় পৃথিবী যে বালুকণার অস্তিত্বের যেমন আলাদা হবার উপায় নেই,—হেসে ফেললাম। কান্না এল চোখে, বলেছি—আর আমাকে চিনবেনা তো, গাছের অসংখ্য পাতার একটি সবুজ ইচ্ছে হলুদ হবে, হেমন্তের এক পড়ন্ত প্রহরে বৃন্তচ্যুত পাতার মর্মরে তার অনেক দীর্ঘশ্বাসের সার্থকতা থাকবে হয়তো। অহঙ্কারী মনে বলেছি আমাকে ভালবেস না, আমাকে বেঁধনা তোমার মূল্যে। যেখানে সূর্য নেই হয়তো সেখানে সবচেয়ে বেশী আলো, সেই অন্ধকারে বেদনার অপারে আমার চাওয়া অশেষ হবে।

তিন

১৯৫২ সালে মৃন্ময়কে প্রথম চিনলুম, দেখেছি তারও আগে। কি সুন্দর ওকে দেখেছি শীতের পোষাকে, বিদেশী পোষাক হলেও বাঙালীর ভিজে বুকটা মরশুমী ফুল আঁকা টাইয়ের মত আকণ্ঠ।

ওর ঘরে বসেই আমাদের পরিচয় সুস্রিতা দীর্ঘায়ত হল, ওর ঘরে বসেই অপ্রাপ্তবয়স্কের উচ্চকতায় এক সারল্যে আমাদের ব্যর্থ ব্যর্থ বয়সী দিনকে নীরবে অদ্ভুত অধীরতায় ভুললাম। মোমবাতি জ্বেলে কবিতা পাঠ করার কটা অবসরকালে আমরাও বুঝি অবুঝ মূর্খের মত নীল আকাশের সিঁড়ি রচনা করেছি।

ওর ঘরে বাঙালীর সব কবিতার সংকলন, ক্যাকটাসের নানা সংগ্রহ, ক্যাকটাসের একা একা অস্তিত্ব। মাত্বরে রঙ ফলান বইয়ের শেলফে বিচিত্র গাত্রাবাস, নিচু খাটে গেরুয়া চাদর ঢাকা।

খাবার টেবিলে ধোঁয়ান মাংসের ঝোল, কাটা সবজি শসা পেঁয়াজ।

মেজেতে সবুজ সতরঞ্চে এক প্যাকেট তাস, অর্দ্ধসমাপ্ত গাঢ় সিঁদুরে ছবি, তুলি, রঙ-ছবির কাজে দরকারী আসবাব, সিগারেট জ্বলা ধোঁয়ার ভুতুড়ে কান্নার মত তালবাঁধা আলো। কখনও ক'টি হাত তাস খেলে, বাজি রাখে—চকচকে আনি সিকি কাগজে নোট। —ক্যাকটাস একা একা একহারা!

তথাগতের অস্থি-র মত সেই সব মুহূর্ত্তগুলি পুণ্য পবিত্র অবিনশ্বরতা পেয়েছে আমার মনে, সেই সব মুহূর্ত্ত বা কাল যখন আমাদের দীনাতিদীন অস্তিত্বেও মানবসূত্রের একনদী উৎস হতে বহুতার বহুদূর সঙ্গমের নীলোচ্ছাসে নিজেকে মেলাতে কোনও বাধা মানেনি। সংসারে আর সবাই যখন মস্ত কথা নিয়ে স্বার্থসঙ্গ নিয়ে জীবনের গৌরব পেতে ব্যস্ত তখন আমরা যে কথা ভেবেছি—বলেছি তা প্রলাপ বলেই প্রতীত হবে আর সবার মনে, কেননা আমাদের কথাগুলো সংসারের সোজা সড়কে পথ পেতনা। তার কি একটা মস্ত মানে ছিল—কে জানে?

ওর ঘরে বসেই আমরা স্মৃতিচারী হতুম। একদিন সে বললে—তুমি তো ছিলে সমাজবাদী এক আন্দোলনে, শুনেছি সে দল থেকে ছিটকে এসেছিলে। —প্রেমে পড়েছিলে? স্বল্প ভারী ঠোঁট তুলে হাসির রেশ টেনে আনত ওর নীল চশমার কাঁচে,—পার্টি ছাড়লে, প্রেমে পড়লে? —আমার এক কবি বন্ধুর প্রথম বইয়ের প্রচ্ছদ

এঁকেছিল সে, তার কবিতাই আবৃত্তি করেছিল···কোথায় ছিলে তুমি ভোরের সরোবরে!

বলল—ভালবেসেছিল কি সে?

আমার কবি বন্ধু সম্পর্কে যতটুকু জানি ততটুকু বলি—হয়তো সে যাকে ভালবেসেছিল আমিও তাকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু সে কাহিনী অবান্তর। মনে উত্তুঙ্গ অহঙ্কার আমার, বলি নে যে কাউকে ভালবেসেছি, অহঙ্কার বা ভীরুতা যা'ই বল। আমরা সে মেয়েকে ছুটো কুন্দ কুড়িয়ে এনে দিয়েছিলাম, আমরা ছুজনে। কিন্তু সেই সব মূঢ়তা নিয়ে কি লাভ বল? আমরা আমাদের প্রতিমাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছি শুধু আমাদের কল্পনায়। আমাদের প্রাত্যহিকতায় তার স্বপ্ন ছিল উৎসবের, এক অজরা সৃষ্টির। মনে হয়েছে প্রেমানুভূতি চিরন্তন পলাতকা,—উৎসবের সুন্দর অনুরাগের, আকাশের বলাকা মেঘের মত সতত অপসৃয়মান-দুর্বাশীর্ষে শিশির বিন্দুর মত অব্যয় তার ব্যাপ্তি।

কখনও ধোঁয়ান মাংসের ঝোলে চুমুক দিতে দিতে মৃন্ময় বলত—প্রেমের কবিতাই তাই প্রেমের অক্ষয় পরিচয়। সিগারেটের ধোঁয়া তুলে স্মৃতিচারী গল্পে কটা বসন্তের এবড়ো খেবড়ো পথের বাঁকে আমরা যেন হঠাৎ পৌঁছে যেতাম।

ময়দানের শিরীষ মুচুকুন্দ আর নরম দুর্বার সবুজ, অস্থির অস্থির আবেগে বৈরাগীর একতারার মত টুং টাং করে উঠেছে সে সময়। কৃষ্ণচূড়ার স্তবকে স্তবকে যেন আমাদের হৃৎপিণ্ড সমস্ত রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছে।

রোজ বিকেলে দেখা রাজপুত পুলিশের ঘোড়ার দৃপ্ত স্বাস্থ্যোল্লাস,

পাহাড়ী ধাই মেয়েদের কোলে নিষ্পাপ শ্বেত শিশুদের সারল্য আমাদের চোখের চাওয়াকে পবিত্র করেছে। এমনি একদিন সেই সব দুরন্ত দিনে আমাদের বাসনার সোনা মোমবাতির মত গলে গেল।

মৃন্ময় প্রশ্ন করেছে—ভূতচৈতন্যে আস্থা হারিয়েছ ?

হাসলুম—দর্শনের কথা যদি বল আমার জীবনটাই নাস্তিকতা, নীতির কথা যদি বল মানুষকে মানুষের জীবন দানে যা কিছু পারগ আমি তাতেই রাজী, অন্য কিছুতে নয়,—ঈশ্বরে নয়, অধ্যাত্মেও নয়।

আমাদের দেশের কথা ওঠে, সমাজের কথা বলি, শিল্পের কথা ; নানা কথা, ব্যক্তিগত কথার টুকরো টুকরো কথার অপার ব্যঞ্জনা ছিল।

আমি জানি কলকাতার কোন এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী এক মেয়ে ইদানীং মৃন্ময়কে প্রভূত স্নেহ করত—আমি বলেছি—তুমি কি আশা করনা সে মেয়ে তোমাকে ভালবেসেও থাকতে পারে ?

মৃন্ময়ের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়েছিল সে কথায় আর্থিক সাকুল্যের কথায় সে বললে—আমি বিবাহের প্রস্তাব করতে যাব নাকি বলতে চাও ?

বলেছি—না তোমার ভালবাসাই জ্ঞাপন কর।

—কেমন করে বলব সেই কথাটা। আমিও যে ভালবাসতে চাই সেই কথা।

হঠাৎ আমাদের কথার ছেদ টানতে হয়—আমাদের ভাবনার একসূত্রিতা। ঢক ঢক করে খানিকটা কাশির ওষুধ খায় সে। দেরাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল, ঢোলা পাজামা আর কতুয়া, চুল ঘাড়ের উপর নামান সুন্দর পিঠ। যেন অনেক অস্বীকৃতি

আর অনধিকার, কিছু আত্মপ্রবঞ্চনা। কতগুলি চড়ুই পাখী হলদে ডানার দাপাদাপিতে ঘরে ছায়া ফেলে—ছায়া বিকেলের পলাতকা ইচ্ছার—উড়ছে, বসছে, ডাকছে। নূতন উপন্যাসের প্রচ্ছদ আঁকতে ওর তুলি তরান্বিত হয়। ছবি আঁকতে আঁকতেই বলে—এমন একটা ছবি আঁকব ভাবি—জান তাকেই আমি ছবিটা দেব। যেন সে ছবিতে অবাক করে দেবে, নূতন পৃথিবীর ঠিকানা জানা হয়ে যাবে,—অনন্ত ভোর বেলাকার আলো।······এমনি তার চোখে স্বপ্ন।

বলি—দিও ভালবেসে শুধু দিও, পেতে চেওনা কিছু। হাসির ঠোঁটে হাসি এসব কথার চমৎকারিত্বে রক্তের নিগূঢ়ে অনেক গভীরে সাড়া দেয়।

ওর ঘরের জানালা থেকে দূরে লেবেল ক্রসিংয়ের লাল সিগন্যাল চোখে পড়ে। সেখান থেকে দূরে দৃষ্টি তার আরও দূরে—লখগৌর লাল ষ্টেশন, রগনলালের গানের সুর, লাল সুরকির পথ, জামিরের নারিকেলের ছায়া—রীতার চোখের আলো আর অমিতার খোঁপায় লাল ফুল—একটা ছবি আঁকা হবে। তুলি থামিয়ে ও বিকেলের রঙভরা বাটির মত যতটুকু আকাশ দেখা গিয়েছিল জানালার বাইরে সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল।

আমি বললুম—যে শিল্পী—সে নিজের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু কি ভালবাসে?

সে বললে আজ পর্য্যন্ত সেই কথাটাই জানাতে পারিনি যে আমিও ভালবাসতে চাই। কফিন দিনের অন্ধমুখ তুলে সে যেন কি খুঁজলে তারপর বললে—মণিরাকে চিনতে তো যে এখন সিনেমায় নাম করেছে। অনেকদিন তার কাছে ছিলুম, তখন আমিও সিনেমায় ছবির কাজ করি।

কলকাতায় এক বাসায় থাকি। রাত্রে এলোচুলে ঢোলা কামিজে মাথা নিচু করে এসে বসে থাকত সেই মেয়ে। ছবির কাজ কতটা এগুলো, এ গল্প সে গল্প, নিউ মার্কেটে অর্কিডের দাম, সীতারামের দোকানে এক একটা সাড়ীর কি অসম্ভব দাম, কটা ফুলের দোকানে ক্রিসেন্থিমাম, আর রাস্তায় আতস বাজীর মত হঠাৎ জ্বলে ওঠা বিজ্ঞাপনের গল্পের মত রাত্রি দীর্ঘ হত। এসপ্লানেডের শেষ ট্রামে ফিরে আসি আমরা, সেই সব রাত্রি—আমার কৌমার্যের গাঢ়তায় নীল হয়ে আসত। ফাঁপা ফোলা তার মাথার চুলগুলি শুভ্র চাদরে অনেকটা পাশ জুড়ে থাকে—সে শুয়ে থাকত অন্য খাটে; বহুদূর সমুদ্রের কাল কাল ঢেউয়ের ফেনার মত তার চুলের নিঃস্বনে ঘুমন্ত দ্বীপের মত তার ঠোঁটের ভাষা অবাক—তার মুখ জেগে থাকত। অনাহূত আপেলের মত তার দুটি স্তন অবারিত। মধ্যরাত্রির চাঁদ আমার ঘুম ভেঙে কখন যে আবার আলো ফেলে জানি না!

কোনোদিন সে দ্বীপের ঘুমকে, স্বপ্নকে আমি মুছে দিতে দিইনে, আশ্চর্য, নিটোল নিটোল সেই সব নীল রাত্রি শেষে পবিত্র অটুট এক কৌমার্যে আমি ফুলের সুরভিত সত্তায় জেগে উঠি।

আশ্চর্য ছিল মণিরা, পর্দ্দায় ওর নাম ছিল মণিরা। ছবিতে কাজ করার জন্যে ওর মনে কিছুটা কুণ্ঠা ছিল হয়তো, একদিন ও বললে—অদ্ভুত আমাদের দেশ, ছবিতে কাজ করব তাতে মন্দ হবার কী আছে?

—আছে ঠিকই কিন্তু সেও আমাদের একটা নোংরা মনোভাবের জন্য। ভোরে আপেল কাটতে কাটতে সে গান গাইত, সাদা ঝকঝকে দাঁতে স্মিত মধুরতা—আপেল খেতে খেতে হঠাৎ ঠোঁট চেপে ধরত—আমার মাকে দেখ আর আমার রোগা ভাইটা, ছবিতে যদি কাজ না করতুম কোথায় দাঁড়াতুম আমি আমার বিধবা মা আর……

বলতে বলতে চুপ করে যেত। গরম হালুয়ার বাটিটা আমার মুখের কাছে তুলে ধরত,—খাও জুড়িয়ে গেলে খাবে নাকি, হেসে ফেলত, বলত—আর তা ছাড়া তোমাকে দিলামই বা কখন, নিজের কথাই কেবল বলছি না ? চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, হাতের থেকে সেফটি রেজর কেড়ে নিয়ে, চীৎকার করত—চা খাবার সময় তোমার যতশত দাড়ি কামাবার তাড়া।

আর একদিন সে চলে গেল, ছবিতে একটা মোটা অঙ্কের কণ্ট্রাক্ট পেয়ে, চলে গেল বোম্বাই। জুহুর সমুদ্রে তোলা তার অনেকগুলি ছবি পাঠিয়েছিল—স্নানের খাটো পোষাক পরা ছবি !

চার

এপ্রিলের এক রাতে পার্কষ্ট্রীট ধরে হাঁটছি। আমি আর মৃন্ময় মিত্র। পার্ক ষ্ট্রীটের পিঠে চৌরঙ্গীর লাল সবুজ আলো, সাদা ঝকঝকে ট্রামের সারি, এসফালটে সাদা সাদা দাগটানা পথের নিশানা। ফিটনের দোদুল্যমান ক্লান্তির মত অদূরে বোর্ণানী ম্যানসন।

গঙ্গার উপর আরো কতকাল পরে মৌসুমী মেঘেরা মুখ দেখবে—পিছনের পথটায় কটা সবুজ গাছের অন্ধকার জেগে রইবে—তখনও জ'লো হাওয়ায় তাড়া খেয়ে কটা ভীরু ডানার পাখী এসে বসবে। আজও তারা আগুনে মেঘের দিকে একবার উড়ে গেছে, তারা কোন পাখী ? প্রকাণ্ড সূর্য আবির মাখিয়ে দিলে তাদের ডানায়, শেষ

বসন্তের রাঙা প্রহর শেষের গান নিয়ে ঠোঁটে তারা উড়ে চলে গেল মানস সরোবরের দিকে।

মৃন্ময় বললে একটা ছবি আঁকব ভাবছি কিন্তু একটুও সময় পাইনে।

আমারও একটা বড় স্বপ্ন ছিল, বলেছি—এত অফুরন্ত সময় আমরা কোনও দিনও পাবনা যখন আমরা খুসী মত ছবি আঁকব গান গাইব পড়ব লিখব বাগানে ফুল ফলের ফলন চোখ ভরে থাকবে।

—কাজ করবে কখন? মৃন্ময় বলেছিল। —ভাত কাপড়ের জন্য আপ্রাণ কাজ আর কাজ, আমি বলেছি—বিস্টলি গসপেল অফ ওয়ার্ক।

বিলাসবিপনির কাঁচ ঘেরা আলোয় পাখীর ছবি চোখে পড়ল—কটা নিসর্গ পেইন্টিং। আমার ঘরে মাটির নীল পাখী দেখেছ,—মৃন্ময় বললে—ওটা ফরিদপুরের পুতুল। আর একটা ঘোড়া কিনেছি।

আমি বললুম—পুতুল কেনার বাতিক ছিল আমারও, কিন্তু আজকাল মেলার পুতুলগুলি কি বিশ্রী!

পুতুল। রীতা আর অমিতার আশ্চর্য মিল ছিল মুখে, অমিতা হলেন রীতার মাসীমা, সেই সূত্রেই আমার পরিচয়। মৃন্ময় বলছিল—অমিতাদির স্বামীকে দেখেছ তো, এত ভাল আর শান্ত সে—আমার হৃদয়ে তুষারের ঝড় বইত ওকে দেখে। অথচ অমিতার জন্যে আমি আমসত্ত্ব কিনে পাঠাই আর গুজরাতী হালুয়া কড়াপাকের সন্দেশ। জান'ত' মেয়েরা কড়া পাকের সন্দেশ খেতে ভালবাসে। পুতুলের মত ওদের আমরা সাজাই, মনের রঙ টেনে দিই ওদের চোখের আয়ত আলোয়, ভ্রূর নিবিড় কালোয়, ভঙ্গীর ব্রীড়ায়। প্রতিমা যদি গড়া যায় পূজার ফুলের অভাব থাকে না।

বোর্ণানী ম্যানসন পিছনে রেখে আরও কিছুটা হেঁটেছিলাম।

ইঙ্গ-ভারতীয় মেয়েরা আসছে যাচ্ছে, চটুল তাদের নগ্নপিঠ, সাড়ী পরিধানে দুঃসাহসিক পটুত্ব ওদের, পেটের অনেকটা অনাবৃত, সাদা বেগুনের মত নরম ত্বক সুন্দর নিতম্ব আর বক্ষোদেশ। সুন্দর অথবা মাংসপিণ্ড, অথবা অনিশ্চিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা, ভয়ঙ্কর উল্লাসের শূন্যতা ওদের বা হেলেনী সৌন্দর্য্যের মত মেয়ে, সেও আছে—অজন্তার আলো। সেই মেয়েটিকে দেখলুম না। সেই একজন পাহাড়ী মেয়ে সেখানে বাসন বেচত—তামার ওপর কারুকাজ করা বাসন, পাথরের মালা—পাথর সবুজ রক্তমুখী।

পোষাকের দোকানে গেল মৃণ্ময়। পোষাকের দোকানে সেই ফরাসীকেতার মেয়েটির কোন দেশে ঘর ছিল কে জানে, অনেক দূর দেশের মরমী বোনের মত চোখ তার, সন্ধ্যার আলোর মিনতিতে অনেক হাতছানি। পথচারী মানুষদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। দিনসাঙ্গের বাঁশি শুনে উতলা হ'ত আর হয়তো ভাবত, ঈশ্বরের সন্তান সকলে বুঝি মেষশাবকের মত নিরীহ!

পথ হাঁটলাম আরও কিছুক্ষণ।

ও বললে জেনেভায় শেষ পর্যন্ত কি হল?

—চুক্তি।

আমাদের দেশ আর জবাহরলালের ছবি আমরা ভুলিনে, যেমন আমাদের যৌবন পোড়ামাটির উপর যন্ত্রণার সাজ পরিয়ে দিতে নিঃস্ব হয়। চেনা লোকদের মুখ আমাদের অহরহ তাড়না করে। আমাদের সামাজিক প্রত্যয় আর প্রস্তুতি, মান্ধাতার সঙ্গে মানব সূত্রের নানা বিবাদে আমরা পথ পাইনে। শুনি নানা বাঁধের জল শস্যের আলে পৌঁছেছে, ময়ুরাক্ষী অন্ধকারকে আলোকিত করছে, দামোদরের জল মাইলের পর মাইল শস্য সবুজের বুক জুড়িয়েছে।

তত্রাচ আমাদের বুক জুড়োয় না—এত শুষ্ক জিহ্বার গঞ্জনা যদি না শুনি তবে জলের পাত্রে জল ঢেলে কিছুটা জুড়োতে পারি হয় তো। ঈশ্বর বিহীন এক মন্দিরে ধূপ জ্বালান হয়, আরতি ঘণ্টা অবশেষে এক আতর্তি জেগে রয়। যক্ষায় ক্ষয়ে যাওয়া অবশেষ কালে যক্ষা নিরোধের এক আন্দোলন গড়ার মত আমাদের শপথ, প্রার্থনা, ক্লান্তি, শান্তি।

অতঃপর ওসানিয়া বারে বসে আমরা কিছু বিয়ার পান করি। বাংলাদেশের এক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে দেখা হল যার আশ্চর্য আশ্চর্য ছবি আমরা দেখেছি।

আশ্চর্য আলোয় সাঁওতালী মেয়ের কাল খোঁপায় লালফুল, গ্রামের বটফল খেঁতো পথে গোধূলীতে গোরুর গাড়ী, বাঁশের বঁনাচ, গঙ্গার ঘাটে মাস্তুল তোলা জাহাজ।

কেবিনে আপেল সেদ্ধ মেচভরা, লাল মদ আর গাঢ় কামনার মদালসা মেয়েদের চোখের মৃত্যু, কাল চুলে কালহীন যাত্রার বিদায় যাচঞা, রিরংসা শেষে ঠোঁটের বরফে নীল, যাবত যন্ত্রণায় তাদের থমকানো স্তন, আর সেই সব কালপুরুষের প্রতিহিংসায় উল্লোল রক্ত—অযোনিজ সৃষ্টির জন্মাকুল প্রতীতিতে আমাদের চোখে ভেসে এল।

সেই শিল্পীর মুখে কালহীন কথার কিছু শুনলাম—শুনলাম মহাঞ্জোদারোর উষার পাখী—রঙের আঁচড়ে, হৃদয়ের অতলে অনাদ্যন্ত-কালের আকাশ ছুঁয়েছিল। তারা চলেছে, বিরতিহীন তাদের যাত্রা।

অ্যাসিরিয়ার নক্ষত্র গণনায় যারা নদীর সাফল্য চেয়েছিল, গোগাঁর মত বেদনায় সেই কুষ্ঠরোগীর মুখ চুম্বনে পৃথিবীর স্বাদ জেনেছিল যে, তারা জানে মানবতার দিকচক্রবালে অসম্ভব মধুর স্বপ্ন আছে এক রক্তাক্ত জ্রূণে সংক্রান্তিত অমরতায়। তাদেরি কাউকে দেখলুম—সেই শিল্পীকে, অথচ কি ক্লান্ত বেদনাহত সে, কি সার্থক অতৃপ্ত!

সেই শিল্পীর মুখেই শুনলাম—আমাকে সেই নারীকে দেখিয়ে

দাও যার সত্তার নিঃসারে আমি লীন হতে পারি, তার রক্তের অববাহিকায় অমোহিত দুর্গমে—যেখানে শিল্পের সুষুম্না পদ্মটি ফুটতে পায়নি আমি সেখানে সূর্যকে নিয়ে যাব, আমি অন্ধকারে, মৃত্যু হতে জন্মজন্মান্তরের বিমুগ্ধ বাসনার ললিতে, অচরিতার্থ সেইসব আপাতঃ আরাম মূঢ়তায় ঘুমকে ছিনিবে নেব, দুঃস্বপ্ন বিভীষিকা শেষে নবনব জন্মান্তর হবে আমার—আমার সৃষ্টির !

আমরা সেই শিল্পীর চোখে সাযুয্য খুঁজি আমাদের অজ্ঞানতার তিমিরান্ধ অস্তিত্বোত্তর এক ধ্যানমূর্ত আলো। তাঁর সৃষ্টি আকাশের এক নদী অমরা অববাহিকায় যেখানে সব ফুল মুখ দেখে, অমৃতময় ফল—আমাদের প্রেমও স্বপ্ন।

বার ছেড়ে এলাম, পার্ক ষ্ট্রীটে—রাত্রির মিনতিতে অবাক কলকাতার পিঠে কাল একরাশ চুল হাওয়ায় উড়ল।

কে যেন আমাদের মানা করে—কথা ক'ওনা, অনুতাপের নিঃশব্দ অবকাশ আনো, অনুভাবনার অন্ধকারে ডোবো, ডুবুরীর মত প্রশান্ত হৃদয়ের নদীতে তাকে পাবে, জানবে ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা সে,—তোমার প্রেম ও মুক্তি অক্ষয় হয়ে আছে ; কাছে অথচ দূরে, জোনাকির অন্ধকারে বা অন্য মহাদেশের আলোয়—বুদ্ধিতে বা অবাঙ্‌ মানস গোচরে।

পাঁচ

অচরিতার্থতা,—আকাঙ্ক্ষার ছোট ছোট উইঢিপি আমাদের অস্তিত্ব, অসংখ্য দ্বৈপায়নতা তাদের। নিজের হাতে রোপণ করা তরুলতায়

ফোটা ফুলের সবটুকু রঙ, সবটুকু সবুজ—মৃত্তিকার যেমন, আমাদেরও তেমনি সাহস ও জীবন যৌবন ও বেদনা এই পৃথিবীর মানুষেরই মুখ চেয়ে ভালবেসে বেঁচে আছে। তাই একটা ছবি আঁকবার স্বপ্ন ভোর বেলাকার আলোয় স্থির হয়ে থাকে। রীতা, মণিরা, অমিতা আপন আপন ভাগ্যকে কালপুরুষের হাতে তুলে দিল—যেমন জানি আমাদের দিনের কথায় তাদের নিঃসঙ্গ বেদনার কিছু অংশ আমাদেরও পেতে হয় তাই। আমার কাহিনী যাকে নিয়ে সেই মৃণ্ময় মিত্রকেও তাই মনে রাখি, ওর সান্নিধ্য একটি করুণ ছবির মত রঙীন হয়ে ওঠে।

মৃণ্ময় বলত—অমিতার স্বামী যদি এমন ভাল মানুষ না হতেন তবে আমার প্রেম হিংসুক হতে পারত, একদিন ওকে ছিনিয়ে নিতুম।

অমিতার স্বামী খুব পান খেতেন, পানে এলাচদানা ছাড়িয়ে রাখতে রাখতে অমিতা করুণ হেসে বলেছে—ওঁর গাম্ভীর্যের ঠোঁটে এই পান খাবার জন্যে কতকটা রঙ, ওঁর অন্য পাণ্ডিত্য আর যাই থাক সে এমন স্থির জল যেন কোন আকাশের আয়না নয়, সব ঢেউ তার নির্বাক, এ কালের হাওয়া লাগেনি সেখানে।

অমিতার চোখে দু ফোঁটা জল জেগে রইত, যেন টলমল মুক্তা, আঁচলে অতর্কিতে মুখ মুছবার ভান করে চোখের জল মুছেছে আর হেসেছে, বলেছে—তবু এই সব ফুরিয়ে যাওয়া দিনের আড়ালে আমি যেন গ্রহণের মত লুকিয়ে থাকব।

অমিতার গান গাইবার আশ্চর্য ভঙ্গী ছিল—মুখে যেন কিছু শুধানোর স্তব্ধতা, চোখে নিবিড় নির্জ্জন নক্ষত্রের আলোর ইসারা —ও যেন সব প্রাত্যহিকতার বাইরে হঠাৎ সতিমির সুরের সত্তায় গানের প্রতিমায় দীপ্ত হয়ে উঠত।

মৃন্ময় বলেছে অমিতাকে—তোমার স্বামী গান তো ভালবাসে, তোমার গান ?

অমিতা ঠোঁট উলটে বলেছে—গানকে নয়, গানের বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলে, আমার সুরের কোনো সাড়া নেই ওর মনে। খুব দাম দিয়ে সাড়ী কিনে আনে, অথচ আমাকে ঘিরে যে সাড়ীটার গৌরব তা বলেনা, কেবল সাড়ীটার দামের কথা নিয়ে সেটা কত ভাল সেই কথাই বলে।

আমার অনেক আছে দেখ, কোনও অভাব নেই, অথচ আমার কিছুই নেই। তুমি ছাড়া আমাকে কেউ বোঝে না, তুমি ছাড়া আমাকে কেউ সুন্দর দেখেনা।

এ বাড়ীতে আমি যেন বেমানান কিছু। আপন দুঃখে গান গেয়ে উঠি, আপন খেয়ালে চাকরটার সঙ্গে বাগানে দৌড়ুই, অকারনে হাসি। ওরা বলে আমার নাকি ছেলেমানসির বয়েস গিয়েছে। বেহায়া, অবুঝ, খুকী বলে লোকে আমাকে কেবল নিন্দাই করলে। আমাকে কেউ বুঝলে না।

আমার দীর্ঘ জীবন আমাকে ক্লান্ত করে—অমিতা বলত। আর আমার স্বামী অনায়াসে সবকিছু মেনে নিতেন—এক অভ্যস্ত স্থবিরতায় স্থির স্থবির বৈনাশিকের মত বসন্তের অপার ইচ্ছাকে নিষ্ঠুর আবেগে তিনি মারলেন আর মারলেন।

ওঁর কঠিন অসুখ করলে, বলতে নেই, অসাধ্য সেবা করলুম। ওঁর হীন স্বাস্থ্য, স্বপ্নলেশহীন প্রাত্যহিকতা আমার কান্নায় আরো পাথরের মত কঠিন হল।

মৃন্ময়ের মনে পড়ে অমিতা কেমন চুপ করে থেকে—অনেক কথার অন্ধ অবয়বহীন নিঃশব্দ ভেঙ্গে বলেছে—তোমার মুখ দেখে মনে হয়

কে যেন তোমাকে মেরেছে, আর মনে হয়,—মাথার চুলগুলি এলো-মেলো করে দিয়ে বলত,—শরীরের যত্ন একটুও নাওনা, যেমন চুল তেমনি মুখের ছিরী করেছ, তোমার জন্য পাগল হব নাকি ?

আর বলেছে—তোমার এই সুন্দর মুখ তোমার চোখ ভরা স্বপ্ন, —মৃন্ময়ের মুখখানা দুহাতে ধরে বলত, কি অদৃষ্ট আমার তোমাকে আমার কিছুই দেবার নেই। বুকের মধ্যে ওর দুটো হাত টেনে নিয়ে বলত—দেখ দেখ, আমি কত নিঃস্ব, হৃতসর্ব্বস্ব !

এক দিন এক নূতন মানুষ এল অমিতার জীবনে—ওর অঙ্কে এক নবজাত শিশুর আবির্ভাব অমিতাকে স্থির আগামীর আশ্রয় দিলে, ওর পলাতকা স্বপ্নের সাধ স্থিত সৌধ হল।

অমিতার স্বামী একদিন বিলেত গেলেন, সেদিন ওকে বিদায় দিতে মৃন্ময় সঙ্গে গিয়েছিল। ফেরার পথে খিদিরপুরের ফটক পেরিয়ে ট্যাক্সী থেকে নেমে পড়লে অমিতা, কান্নায় ভেঙে পড়লে সে, বললে—আমি জানি আমাদের অভ্যস্ততারও অবসান এখানে এই শেষ, ও আর ফিরবেনা। ওঁর খ্যাতি পাণ্ডিত্য, আরো আরো অর্থাগমের আশা, ওঁর হীন স্বাস্থ্য ওঁকে আর ফেরাবে না। কিন্তু আমাকে আরো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

—তোমার ছেলে আছে তো, তাকে নিয়েই তোমার সব,—বলেছে মৃন্ময়।

অঝোরে কাঁদছিল অমিতা আর অভিযোগের সুরে বলেছিল—আমি জানি—আর তুমি আছ তোমাকে স্বার্থপরের মত নিজের মধ্যে টেনে এনেছি, অথচ তুমি কিছুই চাও নি।

—এই যা কিছু সান্ত্বনা এক অপরিসীম মূর্খের সান্ত্বনার মত

অমিতার মুখের কথা আমাকে ঘুম পাড়ায়, আর ভোরের আলোয় একটি ভ্রমরের মত গুঞ্জন তোলে অপার সৌরভে,—আমাকে বলেছিল মৃন্ময়।

আমি ভাবি সবকথা একদিন কালের হস্তাবলেপে মুছবেতো, কিন্তু সেইসব সুন্দর বেদনার নিটোল নিটোল মুহূর্ত্তগুলি দুপুরের সমস্ত বিষন্নতা মেখে রি রি করে উঠবে, আমাদের অস্তিত্বের এক মহৎ অতৃপ্তির মত তারা পুড়বে। তখনও মৃন্ময় প্রচ্ছদপট আঁকবে, কপাল জুড়ে ফোটা ফোটা ঘাম জমবে, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে যাবে। আমি জানি ওর মুখ দেখেই বুঝি সব পাওয়াকে সে অস্বীকার করেছে, আর এক মনোরম বিরহে সে কলকাতায় বেঁচে থাকে, ছবি আঁকে, আর কিছুই হয় না। আমাদের কৈশোরের রৌদ্রোজ্জ্বল আল্পনায় তাদের আঁকাবাঁকা পায়ের চিহ্ন অলকনন্দার অত্যুজ্জ্বল বেদনার নীল জলে গিয়ে মিশেছে, সেখানে আর কেউ কি আমাদের নিয়ে যাবে? —অলকনন্দা—একরাশ চুলের চুম্বনে তার পিঠ ফেরান কোটিকল্প জীবনের সাথে অস্থির অস্থির তার মুখ আমরা দেখিনে!

আর একটি দিনের কথা বলি—আর একটি দিনকে আমরা গোড়ালীতে মাড়িয়ে চলেছিলাম। মৃন্ময়ের চোখে থমকানো সন্ধ্যার আলো কেঁপেছে তখন, তার চোখে কারও টোল খাওয়া গালটির নিচে একটি কাল তিল, আর কালো চু লের কবরীতে লাল ফুলের গন্ধ। সে একরাশ লাল ফুল কিনেছিল।

দমকলের বাড়ীটার পাশে দাঁড়িয়েছি। একজন লাম্বা পাথর জড়ি বুটি বেচছে, দেখছিলাম। একজন মানুষ, মানুষ বলব কি তাকে,

কাটা, ছেঁড়া, শ্যাওলা জমা মুখ তার, চোখ মৃত বিড়ালের মত, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে বললে—কিনুন, অনেক পাবেন।

—কি পাব? আমরা প্রশ্ন করলুম।

কি পাব তা সে বলতে পারেনা। কোনও আশ্চর্য পাথরই আমাদের স্বপ্নকে রূপ দেয় না।

আমরা আমাদের দুর্ভাগ্যকে, আমাদের যন্ত্রনাকে পিছনে ফেলে উড়ে যেতে পারিনে যেমন পাখীরা শীতকে পিছনে ফেলে উজ্জ্বল বসন্তের সরোবরে উড়ে আসে। যন্ত্রনাকে এড়াতে পারিনে পেরেক বেঁধা আমাদের অনুভাবনা। চলে এলাম। খেয়াল করিনি, একটা পুতিগন্ধ, পচা, মৃত বিভৎস কিছু আমাদের পিছু পিছু হাঁটছিল, দেখলুম সেই লোকটা।

হাতে একটি মৃত ছাগল ছানা, নির্ব্বিকার সহতায় দুলিয়ে দুলিয়ে নিয়ে আসছে।

মনে হল সে অঘোর তান্ত্রিক কিম্বা পৃথিবীতে একদল মানুষের একজন যারা অসুন্দরকে গা পেতে নেয়,—অসুন্দর, গ্লানি, অহরহ মৃত্যুকে সয়ে যারা পৃথিবীর জীবনকে উর্দ্ধশাখ করেছে তারা ওরা। প্রার্থনা করলুম আমাদের পাপকে যেন তারা ক্ষমা করে।

কেননা আমাদের মন বাসনায় বিবিক্ত—ভয়ঙ্কর বিবসনা শূন্যতায় আমাদের হৃদয় এক অনিয়ামক প্রভু! সেদিনই পার্ক স্ট্রীটের কবর-ভূমিতে সমাধির উপর আমরা ফুল রেখে এলাম।

অন্যদিনে পৃথিবীকে মাটিকে যারা ভালবেসেছিল দেখলেম স্বপ্নে সুষমায় স্নেহে মাটিতে তারা ঘুমিয়ে আছে, মাটির সঙ্গে মিশে আছে

তাদের অস্তিত্ব ঘাসে। মরশুমী ফুল জেগে উঠেছে তাদের সমাধি ভূমিতে আর তাদের স্বপ্ন মিলে আছে আকাশে, রোদ্দুরে মেঘে, অন্ধশেষে যোজন জোড়া ভোর বেলাকার আলোয়।

আমরা সেইসব মৃতদের কবরে ফুল ছিটিয়ে দিই—অবশিষ্ট আমাদের অনুরাগ যা কিছু সুন্দর, মহত সৃষ্টির ভাবনায় ওতঃপ্রোত, আজো যা বেঁচে আছে—তার কিছু মিনতি আভূমি প্রণামে আমাদের ক্লান্তিকে অবিশ্বাসের পীড়াকে জুড়োয়। এখানে একজন মানুষ ঘুমিয়ে ছিলেন, শ্রীমধুসূদন—তাঁর সমাধিতে ফুল রাখি—সেদিনটা তাঁর মৃত্যুদিন ছিল।

অন্ধ

তখনও নিজ বাসভূমিতে ততটা পরবাসী মনে হয়নি, কলকাতা থেকে গোয়ালন্দ বিনা ছাড়পত্রে যাওয়া চলে। তাই—সাত পুরুষের দেবতা বাসুদেবকে ফেলে বাবা কিছুতেই আসতে চাননি। কিন্তু যখন ছাড়পত্রের ঝামেলা এল তখন গোল বেধেছিল আমাকে নিয়ে, ঠিক আমাকে নিয়ে নয় আমার বয়েসটা নিয়েই। অবশেষে ঠিক হয়েছিল কলকাতায় বড়লোক কাকার বাড়ীতে থেকে আমার বিয়ের পরোয়ানা জুটোতে হবে। কিন্তু কেন যে ক'দিনের জন্যে পিসীর বাড়িতে থাকতে এলুম, গরীব পিসীর বাড়ি যে ল্যান্সডাউনের ঝকঝকে মার্বেল বাঁধানো কাকার বাড়ী থেকে কেন অনেক বেশী আমাকে কাছে টেনেছিল,—অমিতা ঘাড় নিচু করে কথাগুলি বলছিল, হাতে ছিল টেবিল ঢাকনার নূতন সেলাইয়ের কাজ।—কিন্তু আর না আর কত দিন থাকব বলতো, এই বয়সে মেয়েদের এতটা আপন সাধ সাজেনা তো, এবার আমাকে দিয়ে এস। অমিতাকে বেশ কিছুটা অস্থিত মনে হয়েছিল। রবিবারে সেই দিনটায় মেঘে ছাওয়া বিকেলের পশ্চিম আকাশে রাঙা আলো ঘটা করেছিল।

অমিতার দুটো গাল ধরে বলেছিল সে,—'হিসেব করলে দেখা যাবে তো সবটুকুই ক্ষতি লোকসান, কিন্তু শিয়ালদহ থেকে এই কলুটোলার রাস্তায় যখন পা চালালে, সোজা এলে এখেনে, তখনও কি এই বাঙালমেয়ে জানত যে নিজের চোখ দিয়ে পথ চেনার ভাবনা অনেক। বরুণের হাত দুটো পাগল হল, অমিতার মাথার একরাশ এলোচুল হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে এলোমেলো করে দিলে, 'কিন্তু

কা পাগল চোখ থাকলেই বুঝি সব হয়, সব দেখা যায়, ভগবানকে দেখা যায়, এই জট পাকানো পৃথিবীর নিয়ম কানুন বুঝি বুঝে ফেলা যায় ?'

অমি আর একবার ক'লকাতায় এসেছিল যখন বয়সে সে কিশোরী। ফ্রকপরা সেই সেদিনের অমির একরাশ মাথায় সোনালী চুল ঝাকড়া ঝাকড়া, চোখ বড় বড়, শহরের বাস ট্রাম রাস্তা, দোকান-পাট, জু ম্যুসিয়াম ছবিঘর দেখে দেখে অবাক—অবাক—অবাক সে। বরুণ তখন অমির কাছে মস্ত মানুষ, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়া ছেলে সে। সেই বরুণদাদা একলা যেদিন অমিকে জ্যু দেখাতে নিয়ে আলিপুরের পথ হারাল অমি বুঝি সেদিনই প্রথম ধরে ফেলেছিল বরুণদাদা ঠিক ততখানি বড় নয় আরো কেমন অনেকখানি সে ছেলে-মানুষ যেন, নইলে অমন অশান্ত কান্না কান্না মনে হয়েছিল কেন ওকে। যদিও পথ খুঁজে পেয়ে সে যেন আগেভাগেই রাস্তাটা জানত এমনি ভাব করেছিল। আর মনে আছে সবুজ কার্পেটে পাতা চিড়িয়াখানার ঘাসে সেই সব নেকড়ে বাঘেদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে খেলা করার, চিড়িয়াখানার অন্য একটা দরজা পেরিয়ে রূপোলী হ্রদের অসংখ্য বিচিত্র পাখীর কথা যে সে বলেছিল—মিষ্টি টুকটুকে ফলের বাগানের ছায়া, মিশ কাল কাল মিশর দেশের বিড়ালের ছুটোপুটি, এমন কি বাঘ সিংহের টানা ছুচাকার গাড়ীর সে সব বরুণদাদার ভারী অদ্ভুত কথা সবটা কেবল গল্পই থেকে গিয়েছিল। অবিশ্বাস্য অসম্ভব কিছু বরুণদার কথাতেই তবু বিশ্বাস হ'ত, সম্ভব বলে ভাবতে পারত অমি।

সেই রূপকথার মত অসাধারণ কিছু বরুণদার মধ্যে আছে, কিন্তু তা যে কী তা তো অমি আজও ভেবে উঠতে পারেনি।

কি যেন বুঝে ওঠা যায় না বরুণদার মধ্যে কী আছে? এই তীক্ষ্ণ অথচ মাটির মত ম্রিয়মান মুখখানা—দুর্বার মত সরস, চোখ দুটোতে কান্না হাসির মালা গাঁথা—আলো তার অপরূপ, চোখ ভরে দেখে দেখেও বোঝে না অমি বরুদা কী আশ্চর্য মানুষ!

এবারও বরুণদাদার সঙ্গে অনেক বেড়িয়েছে অমি। ম্যুসিয়ম, ছবির প্রদর্শনী, মিরাকল ইন মিলানের মত ভাল ছবি দেখে এসেছে। শহরের বাইরে দূরে বোটানিকসে, ব্যারাকপুরেও বেড়িয়ে এল। এই ইট পাথরেমোড়া শহরে রূপ ফোটানোর, হিসেব নিকেশ করা কোলাহল-কর্কশ সংসারে গানের সুর জাগানোর, তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতায় ছিদ্র ছিদ্র জীবনে রূপকথার কথায় চোখে স্বপ্ন এনে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা বরুদার।

অমি নিজেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করলে। নিয়ম-কানুনহীন কিছু যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। স্বপ্নের কাজলকে সে চোখের তারা বলে ভেবেছে। অস্থির অস্থির সতত অপসৃয়মান সময়ের মত দিনরাত্রি সে অস্থির ভাবনায় ডুবে আছে। বরুণদা খুব কী আর বদলেছে? কলেজের ছাত্র সেই দেশকর্মী বরুণ, ইংরেজের জেলে বন্ধ রাজদ্রোহী বরুণ, আজ সরকারী অপিসে কেরানী হয়েছে।

জ্বর হয়েছিল অমির। কটা দিন বরুণদার এই অদ্ভুত সঙ্গলাভ ভাবতে আশ্চর্য বোধ হয়, জ্বরের বিষণ্ণ উত্তাপের মত এই কটা দিন যেন তার সমস্ত অস্তিত্ব ভরে আছে। ক'দিনের জন্য সে এসেছিল, ক'টা দিনই বা, এই সকালে সূর্য ওঠার সাড়া, দুপুরের তীব্র তরল রোদ্দুরে চৌকো চৌকো আশার প্রদীপ্ত বেলা, ধুলোট স্মৃতিলীন ছায়া ছায়া স্বপ্নে সমাসীন সন্ধ্যা, রাত্রির নীলাঞ্জনে নিশীথ যামের কত কত তারা, মনে হয়েছে পরিমাপহীন।

—এই বেলা বিয়ে দিয়ে এস আর কতদিন তোমাদের ঘাড়ে বসে থাকব, অভাবের সংসারে আমাকে দিয়ে অনটন বাড়াবো—বলেছিল অমি।

—সিন্দবাদের মত পরিমাপহীন এই সময়কেই যদি বইতে পারি তবে তোমাকে নয় কেন? বরুণ উপহাস করলে, করুণ নির্লিপ্ত তার কথা।

কিন্তু মা বুড়ো হয়েছেন, তিনি সময়কে মুখোমুখি দেখেছেন, ভেবেছেন এই বেলা বরুণকে বিয়ে দিয়ে সংসারে স্থিতভিত না করলেই নয়। তাই একদিন মা বললেন,—চৌধুরীদের মেয়েটিকে একবার দেখে আয় না বরু, দেখতে শুনতে শুনেছি তো ভালই এখন তোর পছন্দ হলেই হয়, ওরা তো বেশ পরিবার, আমাকে খুবই ধরেছে। মার চোখে ভবিষ্যতের স্থিরস্থির স্বপ্ন।

বরুণ আজ মার সেই স্থির স্বপ্নেও কালি ঢেলে দিলে, বললে—মা আমার বিয়েটা তুমি নাই বা ঘটালে, তুমি যে আমার মা হয়ে আমাকে এমন পর করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লাগবে এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না।

মা চঞ্চল হলেন। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টির শব্দ। অপিসের বেলা হল, মা ভেবেছিলেন, বরুণ কী যে ছেলেমানুষ, কিন্তু অনিশ্চিত কিছু ঘটছে না তো, ভাঙা ভাঙা মেঘের মত মার ভাবনা।

তাই পড়শী ভাড়াটেরাও গুঞ্জন করলে, উপর তলার বাসনাদিদি তো স্পষ্ট বলেই ফেললেন,—কথাটা কি জান দিদি, ওদের বয়েসটা নিয়েই কথা, হলেই বা সম্পর্কে বোন তা বলে এতটা স্বাধীনতা, গল্প মেলামেশা বয়েসটা তো ভাল নয় দিদি।

কাল মেঘের মত দুশ্চিন্তা জট পাকিয়ে উঠল। এবার মেঘের জট কাটতে মার কান্না আকুল হ'ল। বরু কী মার আশায় এমন

করে ছাই দেবে ? কি যন্ত্রণা আর অপরিসীম লজ্জা যা হবার নয় যা কিছুতেই ঘটার নয়, তারই অসম্ভব সম্ভাবনায় ওদের রসনা বিকৃত রটনায় নিরন্তর রত হয়েছে। মার চোখের জল দেখেই অমি অসীম অপরাধের পীড়নে পীড়িত হয়েছিল।—কবে আমাকে রেখে আসবে— ? আকুল আবেদন অমির কথায়।

—কেন,—বরু সেদিনও প্রশ্ন করেছিল,—কে তোমাকে মারছে, কি এমন জলে পড়েছ ?

—তবে বিয়ে কর বৌ আন, খুব ক'দিন ঘটা হবে, আনন্দ করা যাবে। অমি প্রসঙ্গান্তরে পৌঁছুতে পারার তৃপ্তিতে হাসল, বৃষ্টির বিষন্ন অনুচ্চ ঝিরঝির ঠাণ্ডা হাসি।

জানালার বাইরে বৃষ্টিতে হাত বাড়িয়ে দিলে বরুণ। —এখনও বৃষ্টি পড়ছে—। অমি টেবিলের উপর থেকে ঘড়িটা নিয়ে সময় দেখলে, ন'টা বাজে। বরুণ সকালে ওর জার্নালটায় কি যেন লিখছিল, অমি তারই একটা পাতা ওল্টালে, এক জায়গায় শুরুতেই লেখা আছে, 'তুমি আমার কে, বন্যা সাতগঙ্গার অলকনন্দা,···

—কে সে যাকে আমি বিয়ে করব—বরুণ নির্লিপ্ত স্বরে বলেছিল, —কে সেই মেয়ে ? জান অমি, আমি সেই কথাই আজ সারা সকালে ভেবেছি, কে সেই জীবন বধূ ?

—কুমার আমি, অনেক কুমারীদের ভীড়ে সেই সব মুখ দেখেছি আর ভেবেছি কে আমাতে বৃত হবে ? ব্যর্থ হয়েছি, তার মুখ আমি দেখিনি। ক্লান্ত, ক্লান্ত আমি, যার মুখ আমি দুচোখ ভরে দেখতে চাই সে যেন দূর সমুদ্রের অকূলে বসে আছে, গোধূলীর ম্লানিমায় তার মুখ রহস্যাকুল; নিশীথ বাতাসে তার নিঃশ্বাস ঝরা

বকুলে মিশে থাকে, দূরাগত পাখীর ক্লান্ত কলাপে তার কণ্ঠের কিছু আভাস আসে।

সে যে মুখ ফিরিয়েই আছে, আছে অসীমের অধরায়। তাকে সীমার মধ্যে ধরে ফেলে বুঝি যে এমন চেনাশোনা আর হল কার সঙ্গে—বরুণের নির্লিপ্ত কণ্ঠ ডুবে গেল আবেশে, তার পর সমস্তখানি গভীরতাকে অনেক তরল করে বলতে পেরেছিল সে, 'চেনাশোনা আর হ'ল কই এই তুমি ছাড়া কার সঙ্গেই বা আমার তেমন চেনা হ'ল।

বরুণ অনেকখানি অব্যক্তের অবুঝ বেদনাকে প্রকাশ করতে পেরে তরুণ তৃপ্তিতে উচ্ছল হতে পারল।

—কী জান কবিতাতেই আমার সকল ভালবাসা থুয়ে দিয়েছি, নতুন করে ভালবাসব বৌ আনব কোন দুঃখে?

অমির পিঠে ছড়ান একরাশ চুল হাতের মুঠোয় লুফে লুফে বললে, —আর এই তো বৌ আমার ঘরেই রয়েছে।

মুখ ফিরিয়েছিল অমি, বুক দুর দুর করল, পায়ের তলায় পৃথিবী নড়ে উঠল। অসম্ভব অসম্ভব এই আমন্ত্রণ, এই অধিকার কল্পনায়ও কলুষ আছে, আছে কলঙ্কের প্রহার। ক্ষীপ্র গতিতে অমি বরুণের মুখে হাত রেখে বললে,—বল না, ভাই বোনেতে বিয়ে হয় না জাননা?

—হো হো করে হেসে উঠল বরুণ,—মানি না মানি না আমি এসব মনগড়া মানা মানি না, আর তা ছাড়া তুমি তো আমার সহোদরা নও।

চোখ ছল ছল অমির তবু মুখে হাসি টেনে এনে বললে—কেন এসব অসম্ভব কথা বলে আমাকে কেবলই কষ্ট দাও, তোমার বৌ হতে কিনা আমার বয়ে গেছে।

—আমার চেয়ে ভাল বর তোমার জুটবে বুঝি ? সমস্যাটা হাল্কা করার জন্যেই বরুণ খুব খানিকটা হেসেছিল।

সে হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে অমি বললে,—পাগল হলে কি অপিসের যে বেলা গেল।

অমি আর বরুণ সেই সকালে বৃষ্টি ঝরা বেলায় যতটুকু হেসেছিল, তাঁদের শুভ্র সুকুমার দাঁতে যতটুকু হাসির ঢেউ চমকেছিল তারও বেশী কিছু বেদনা টুকরো টুকরো নীল বরফ গলা জলের মত হিম হয়ে গড়িয়ে গিয়েছিল।

দুই

লেজার বই—টেবিলের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে তার। টাকা আনা পাইয়ের আয় ব্যয়ের হিসেব লেখা লেজার। লাল কালি, কালো,—দোয়াত কলম। যেসব খরচ চোখে দেখা যায় না, —বন্দরে মাল নামানোর জন্যে, কুলী, কামিন সরকার, পোর্ট কমিশনার্স এস্টাবলিসমেন্টের খরচ নিয়ে বিল অফ লেডিং থেকে ডিউটি ধরে হিসেব মেলানো বরুণের কাজ।

সকাল দশটায় শুরু করেছে, তখন আকাশে বৃষ্টি ছিল, এখন কিছুটা ঝলসানো রোদ্দুর দেখা যায়। অনেক দূরের আকাশে থমকানো মৌসুমী মেঘ। সার্শির বাইরে আকাশে তামাটে দুপুর চমকাচ্ছে। নিঃসঙ্গ চিলের ডানা রিম রিম করছে মেঘ ভাঙা রৌদ্রে।

কে না জানে সরকারী অপিসে কী থাকে কী হয়। কাজ পেয়েছিল, অপিসে নিচু কেতার কেরানী সে, অঙ্ক মিলোয়, হিসেব

মিলিয়ে ঠিক সময়ে দপ্তরে পেশ করে দেওয়াই তার কাজ। অর্থ-বিদ্যাবিদ্ সে নয়, সরকারী কোষাগারের এ ঘর থেকে ও ঘরে খরচ পেশ করা অর্থহীন মনে হয়েছে। অনন্যোপায় জটিল হামাগুড়িতে তবু তার অস্তিত্ব এই যোগবিয়োগের সঙ্গে বাঁধা।

স্কাই লাইট দিয়ে বেলা শেষের সূর্যালোক তির্যক হয়ে আসে। চঞ্চল কতগুলি চড়ুই সেই আলোয় ডানা ভাসিয়ে ঘুরছে আর ঘুরছে।

অদূরে ঘোরান সিঁড়িটার পাশে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে—অপিসের সেই অবাক দীর্ঘাঙ্গী কালমেয়েটির চোখে অনির্দ্দেশ্য কিছু যেন ছিল।

—সময় নেই, এ বেলাই একাউণ্ট পেশ করে দিতে হবে।

অদেখা অনেক কিছু রহস্যের দরোজা জানালা খোলার অবকাশ নেই। কল্পনার নীল মদের যন্ত্রণা ভুলতে পারে না সে। মনে পড়ে কয়েকটি শীতের সায়াহ্ন স্মৃতি গ্যাসলাইটের কুয়াশায় মুখ বুজে কবে স্থির হয়েছিল, কতদিন সে এই বাড়িটা থেকে বেড়িয়ে দেখেছে বসন্ত শেষের কৃষ্ণচূড়া অনন্ত কামনায় আকাশে জেগে আছে! দেখেছে সেই সব কেরানীদের পলিত কেশ, তাদের ট্রাউজারের বেল্ট আলগা। সংসারে পুত্রকন্যার মৃত্যুতে কার স্ত্রী নির্লিপ্ত হয়ে গেছে, তারপর বেকার স্বামীর যক্ষ্মার সঙ্গে যুঝে যুঝে দেহপাত করেছে সেই নারী—দেহও বিকিয়েছে। তবু আশা আছে, অসংখ্য নক্ষত্রের নিচে অন্ধকারের তরলে সদ্যোজাত শিশুর কান্নার ফুৎকারে তৈলশূন্য দীপাধারে কিছু উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষায় তারা বার বার কেন যে হারিয়ে যায় কেউ তা জানে না।

আশা নেই—আনন্দবিরহিত এই দিন যাপনায় আর আশা নেই। সিঁড়িটা দিয়ে নামতে নামতে তারও পা ক্লান্ত হয়েছে। শিথিল

উদ্যম, বিভ্রান্ত বিকেলের ছুটি, ঘর ফেরতা ট্রামবাস, মানুষের ঘাম ক্লান্তি আর ক্লান্তি, অর্থহীন।

—তাই সেদিন সে বাড়ি থেকে অপিস আসার পথে এই কথাই মনে করেছে—'অসম্ভব—অসম্ভব প্রিয়তমে কি অকরুণ তোমার হৃদয়ের দিব্য। অমির কথাই সে ভেবেছে, ভুলে আছে সে মিথ্যা সমাজাচারে। যে সমাজ প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মারছে, যে সমাজ তোমার ফুলের ভূষণ ছিনিয়ে নিয়ে দিয়েছে বিষস্পর্শ স্বর্ণ গহনার বেড়ী, যারা প্রশংসা ও প্রেমকে ঈর্ষায় করেছে বিকৃত, যাদের ভালবাসা স্বার্থপঙ্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, আনন্দের অতুল ভূমায় অকারণ খুশীতে যারা অস্তিত্বের অসারতাকে কিছুতেই খোয়াতে জানে না অমিও কিনা সেই সমাজের মুখ চেয়ে আছে।

—এই মিথ্যা অস্তিত্বের এই ঘৃণ্য আবিল অর্থহীন সমাজ শৃঙ্খলা; নিরঙ্কুশ ঈশ্বরের দোহাই পারাকে বরু কি কোন দিনও মেনে নেবে?

'কি ভাবছেন'? সহকর্মী একজন বরুণকে প্রশ্ন করে।

'কিচ্ছু না,' অপ্রস্তুত বরুণ উত্তর দিলে 'এখুনি বুঝি চারটে বাজল'? এই অঙ্করাশি এখনো মিললো না, লেজারে আর একবার মনোনিবেশ করেছিল বরুণ, অঙ্ক অমিল রেখে কিছুতেই তো ছুটি নেই।

হঠাৎ অপিস ঘরে একটা ছোট ইঁদুর কোথা থেকে এসে উপস্থিত। টেবিলের নিচে মার্বেল পাথরে বাঁধান মেজেতে জোড়া জোড়া পা চোখে পড়ে। এতগুলি পা স্থির, কোথাও বুঝি স্থিরতা জড় ভারী হয়ে ওঠে, কারও পায়ের একান্ত ক্লান্তি অস্থির হলে নড়া চড়ায় যেটুকু খস খস শব্দ হয়, ততটুকুই ইঁদুরটার ভীতিসাধনে যথেষ্ট ভয়ঙ্কর। উৎকর্ণ, গোল চক্ষুদ্বয়ে নিরাপদ সন্ধান দৃষ্টি নিয়ে দৌড়ুচ্ছে

সে মুহূর্তে ঘরের এ প্রান্ত ও প্রান্ত ছুঁয়ে। কখনো হারিয়ে যায় সে, কখনও দৃষ্টি গোচর। এ যেন আলো আঁধারের খেলা, আশা নিরাশার অভিনয়। আশ্চর্য—আশ্চর্য ইদুরটা খুব কাছে এসেছে। লাফিয়ে উঠল বরুণ। —ইঁদুর ইঁদুর—চিৎকার করে সহকর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করলে সে।

—আশ্চর্য ঘোষণা, একটি ইঁদুরের আবির্ভাবে অভিনব কিছু ঘটল তাহলে? অন্যত্র যদিও জার্ণালে অঙ্কে অমিল ঘটবে না, সাপ্তাহিক হিসেব পেশের ব্যত্যয় হবে না। যথারীতি অন্যান্য মিথ্যা রচনার বৃথা কোন্দলের ধূমায়িত মনে একে অন্যকে ঈর্যা করবে, ভুল বুঝবে। নিজেদের দীনদৈনন্দিন অস্তিত্বের অতৃপ্তিতে, তিক্ত বিরক্তিতে নিন্দাবাদ জানবে সেই সব চেনা মানুষের দোষাবলীর কথায় যা রয়েছে তাদেরই অস্তিত্বে ওষ্ঠপৃষ্ঠ হয়ে।

বিস্মিত হবার কিছু নেই। আর বিস্ময়ের কোন অনন্য ঘটনাও নীলাঞ্জন রূপরাশে অসীম আনন্দলোকের অলভ্য স্বপ্নের মায়ায় এখানে হঠাৎ মেঘ ভাঙা সূর্যের আলোর মত ঝলকে উঠবে না।

হোক না সামান্য একটি ইঁদুর, এই অনাত্মীয় পরিবেশে তার অবাক আবির্ভাবের তুচ্ছতম উপলক্ষ্যও যে তার মনের দরোজা জানালা খুলে দিতে পারে, শিশুর মতই সে চঞ্চল হতে পারে, এতে হাসবার কি আছে? হিসেবী জমিনের প্রতিপদে মাপজোপ করে চলার আর বলার কর্মপ্রথা ভাঙলে কি এমন দোষনীয় কিছু ঘটে বরুণ বুঝে উঠতে পারে না। সহকর্মীরা বলেছিল 'ওটা পোষা ইঁদুর ওরে ওটা ওর পোষা'। সেই বিদ্রূপের পিঠে পিঠে হাসির শব্দ আছড়ে পড়ে—হি, হি, হি।

দুপুরের শেষ, আরো অনেক কাক চড়ুই ধূলোট আকাশে গা

ভাসিয়েছে। জানালার বাইরে আকাশের কিছু দেখা যায়। ইঁদুরটাকে আর দেখা যাচ্ছে না, তাকে আর দেখা গেল না, আবার নিরবচ্ছিন্ন কাজের তাড়ায় ইঁদুরটার আসার কথা অতীত হয়ে গেল। এক মুঠো বালি আঙুলের ফাঁক থেকে ঝরে যাওয়ার মতন এই সময়। বিন্দু বিন্দু শিশির ঘাসের শিষে হারিয়ে যাবার মত কতগুলি মুহূর্তের সমাবেশ।

অতঃপর ডেপুটি একাউন্টেন্টের ঘর থেকে ডাক পড়ল বরুণের 'এইটে আপনার সই' ?

—'আজ্ঞে'

'কি করে মিলিয়েছেন বলুন তো?'

'মেলেনি নাকি?'

—'ভুল হল কেন '?

উত্তর করছে না বরুণ।

—আমার সময় নষ্ট করলেন, এরকম যেমন তেমন লিখে ফাইল পাঠাবেন না। বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য ডেপুটির চোখে।

'ভুল তা ভুল হয়েছে ঠিকই তবে'......বরুণ কী যেন বোঝাতে চেয়েছিল।

—তবে আবার কি? ডেপুটি চিৎকার করে উঠলেন প্রায়, সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ডাক পড়ল। ততক্ষণে বরুণ বেড়িয়ে এসেছে অফিসারের সেই নিষিদ্ধ অঞ্চলের ঘর থেকে, বাতাস সেখেনে ভারী, যেখানে চেয়ারগুলিও শৃঙ্খলিত আসনের অলঙ্কারে ভয় মাখানো।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন—ইঁদুরটাই আপনাকে সব ভুলিয়ে দিলে কি অশ্চর্য! সেই ছেলেমানসীর কথায় আর একবার হাসির রোল উঠেছিল।

—আত্মবঞ্চনা, ক্ষুধা, ধিক্কার তিরস্কার এতো আছেই, কিন্তু ছেলেমানষীর মত অর্থহীন অথচ সত্য নিরঙ্কুশ একটু খোলা আকাশের আলোর মত আশ্চর্য মুক্তির জন্যে, আনন্দ লোকের জন্যে সে সকল অপ্রস্তুতির বাধাকে বাধা বলেই ভাবতে প্রস্তুত নয়।

বিকেল। বাইরে বিকেলের ছায়া ঘনতর হ'ল, অনেক দূরে সন্ধ্যার ঘোমটাপড়া অপলক আভাস, ছায়ামূর্তি। এসপ্লানেডের নাগকেশর গাছের তলায় ভিক্ষুক ভিক্ষুণী তাদের সন্তানদের শুকনো রুটি দিচ্ছে। যদিও জার্নালে তার অঙ্ক ভুল হয়েছিল, যদিও সহকর্মীরা হেসেছিল, ইঁদুরটা ওরই পোয়া বলে বিবৃত হওয়ায়, কিন্তু তার খুশী ইঁদুরটার আবির্ভাবের মত এই অনাগতের মুখ দেখার শীর প্রাণোচ্ছলতা অদ্যাবধি তার মধ্যে বেঁচে আছে।

কী সে অনাগত যেখানে দীনাতিদীন অস্তিত্বের অহরহ মৃত্যু নেই? কে সে অদেখা সাতগঙ্গার অলকনন্দা, ধূসর লিপির বিস্মৃত স্বপ্নে মুখ ফিরিয়ে আছে? কোথায় তাকে সে হঠাৎ দেখেছিল যেন, মৌসুমী মেঘের চুলে তার পিঠ ঢাকা, উতপ্ত শুষ্ক ধূলি ধূসরিত নিদাঘে অঝোর জল ভাঙা মেঘের প্রিয়স্পর্শের মত নববর্ষার চিকণ করুণ ক্লান্ত স্নেহে সে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কে সে, একরাশ অন্ধকার মদিরা যার চুল, রুপোলী নক্ষত্রের রাতের অশ্রু টল টল স্থির চিবুক, অশান্ত অশনির মত তাঁর বাঁকা ভ্রূ, অনেক কথা না বলা থর থর ঠোঁট হাস্নুহানার স্মিত নির্জনে তার কথার সাড়া, সমুচ্চ হাওয়ায় কাঁপা রজনী-গন্ধার গান থুয়ে যার তন্বঙ্গী, সে তার কে? কত কত আকুল বর্ষায়, অগ্রহায়ণে হিমন্তি

দিনে, শীতের শিশিরে, বসন্তের নিষ্ঠুর বেদনায় সে তাকে খুঁজেছে আর খুঁজেছে।

ধর্মতলার মসজিদের পাশে মুসলমানদের ফলের দোকান। আঙ্গুর বেদানা, কমলা, মনক্কা আখরোট বাদাম পেস্তা, ব্যস্তপথে সেই সব ফলের গন্ধস্পর্শ রেখেছে বাতাসে আর একটি মুখ যেন চেনা, কারো রোগ পাণ্ডুর মুখের স্মৃতিতে মুখোমুখি প্রশ্ন করেছে ভাল আছে তো সে, ভাল আছে ? সেই ফলওলাদের কারো এক পোষা হরিণ এখানে বাঁধা থাকে। অনেক দিনের ছেড়ে আসা মায়ের কোল, সেই দেশ বনছায়া নরম নরম ঘাসের মিষ্ট এক বন্য অবাধ জীবন থেকে উদ্ভিন্ন—ঘ্রাণ ও পরিচিত স্বাদ ছেড়ে এই খাঁচাঘেরা অস্তিত্ব দীনহীন বন্ধলোকে তার হরিণ চোখ কান্নায় করুণ হয়ে থাকে। গোধূলী লীন সন্ধ্যায় আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র পথে আকুল রহস্যের হাতছানি তবুও তাকে ডাকে—এস, এস। কিছু আঙ্গুর কিনলে বরুণ।

বাড়ি। কুটো খড় আর গোবর ডিঙিয়ে এক গলির পথ, খোলা নর্দমার বুক জুড়ে পাঁকে গা লেপ্টে থাকে অন্ধকার আর অন্ধকার। এই অন্ধকারের বুক ভেঙে যখন সে ঘরে পৌঁছুল তখন শূন্য শূন্য, কেউ নেই। অমি নেই। কেন ? মা, মা—মাকে ডাকবে ভাবছিল, না তার দরকার নেই।

টেবিলের উপরেই অমিতার চিঠি, সাদা কাগজে কটি কাল অক্ষর, 'টুকলু আমাকে পৌঁছে দিচ্ছে ! আপাতত কাকুমণির বাড়ি। তোমার কথাতেই বলি, অনন্তকালের মনের বাসা চারটে দেওয়ালের বাইরে সেখেনে পৌঁছুনোর সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না··· ।'

এক রাশ অন্ধকারের মুখোমুখি তার মুখ, অসহায়। তার

অসহায়তার সবটুকু নমনীয়তাকে মুঠোর মধ্যে এনে, কেমন যেন স্পর্ধা হয়েছিল, এ মেয়েকে ভালবাসতে বাধা কি। পৃথিবীর কার কী ক্ষতি? এই সামাজিক কোন্দল, অসম ব্যবস্থার পীড়ন, দারিদ্র্য রোগ শোকের বহুতর দেয়ালের শেষে কয়েকটি ক্ষণের গ্রহচর মানুষ যখন মৃত্যুর পর চুপ করে যাবে, তখন কী আর থাকবে নিরাকার শান্ত মৃত্যুর বিস্মৃতি ছাড়া?
জ্বর গায়েই চলে গেল অমি, মা কি তবে ওকে কিছু বলেছিল?

আলো নিভিয়ে দিলে বরুণ।

ভোর বেলাই বর্ষা হল, পূজার্থীরা জবা ফুল নিয়ে চলেছে, ঠনঠনে কালীবাড়িতে পূজো পড়বে। রক্তজবার সঙ্গে শুভ্র ক'টি টগর ছিল। ধর্মঘটের নোটিশ পড়েছে ব্যাঙ্কে, দেয়ালে তারই লাল পোষ্টার। এভারেষ্ট বিজয়েরও খবর এসেছে!

অতঃপর দুপুর গড়িয়ে গেল অপিসে। আশ্চর্য, ইঁদুরটা সেদিনও এসেছিল! কিন্তু তত কাছে নয়, সমস্ত ঘর জুড়ে সে ছুটোছুটি করল না। বরুণ কাছে গিয়ে তাকে কিছু বিস্কুট দিলে। না খেল না, ভয়ে পালিয়েও গেল না ইঁদুরটা। অন্ধ, অন্ধ হয়ে গেছে সে। জানালের অঙ্ক আর ভুল হল না। অন্ধ ইঁদুরটার মত বোধ হল সমস্ত আনন্দের দরোজা জানালা বন্ধ হয়ে গেছে।

উত্তর উত্তমা

বেলাশেষে একপাল কাক নেমে এসেছিল রাস্তাটার কোণে। কী নিয়ে ওদের এত অধীরতা? উড়ছে, কাল মিশ মিশে পাখার ঝাপট লাগছে—এক জনের ডানায় অন্যের, উড়ছে, বসছে আর ডাকছে—কা কা! এক পশলা বৃষ্টি শেষের শরতের আকাশের দুপুরটা ছিল নিঃসঙ্গ পাণ্ডুর। জানালার বাইরে হলদে আলোর এলান শ্রান্তি আর দীর্ঘসূত্রী কাকের চিৎকার। অবিরত এক শব্দ। কর্কশ আর করুণের উল্কি আঁকা সময়ের নিরবচ্ছিন্নতা থেকে মুখ ফেরান যায় না, কিছুই ভাল লাগে না আর। ন্যাবাটে দুপুরের আলসে ধরে দাঁড়িয়েছিল অন্য দিনের উত্তমা। এই এদিনের আমিই কী সে দিনের সেই উত্তমা। যাই নিয়ে কাকগুলোর অধীরতা হোক না কেন জানালার এই এখানটায় বসে থাকার নেশা আমার কিছুতেই ভাঙ্গবে না। এই একফালি আকাশ—বৃষ্টি শেষের শেষ বেলার সব ভাবনা থেকে ছুটি নিয়ে চুপ করে বসে থাকা, সব সঙ্কল্প সাধের প্রত্যন্তে নীরব হওয়ার মতো কালহীন মন্ত্রমুগ্ধতায় মগ্ন হয়ে গেছি। মগ্ন—অশেষ যন্ত্রণার মুঠো মুঠো মুহূর্তের রাশ-ছাড়া ক্লান্তিতে শিথিল স্মৃতি শয্যায় ডুবে আছে আমার সমস্ত অস্তিত্ব।

কলকাতা, এই সহরকে এত মন্দ লাগেনি তো কোন দিন, ঠিক ভাল লাগেনি কি আর? বুঝি না। সবই আছে, এত অন্তরঙ্গ চেনা, তবু মনে হয় কেন ওরা কেউ আমার নয়। ভাবছি কতদিন হ'ল এসেছি বাংলা দেশে। মাড়বারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী আমি।

উত্তর ভারতের এক গ্রামে আমার জন্ম, সে দেশের মাটিতেই আমার নাড়ী পোঁতা। তাই কি এদেশকে ততখানি ভালবাসতে পারি নি, যতখানি ভালবাসলে আমি তার ভালবাসার যোগ্য হতে পারতাম। বিমানের ভালবাসা গ্রহণ করার কোন শক্তিও আমার আছে বলে বিশ্বাস হয় না। তাই বলেছি—বিমান, তোমাদের দেশটা মাটির, এত নরম আর সুন্দর ছায়া ছায়া আর শ্যামল কোমল, যেন আঘাত এতটুকুও সইতে পারে না। রৌদ্রে ঝলসে ওঠে, শীতে কুঁকড়ে যায়, একটু বর্ষায় কাদা কাদা হয়ে ওঠে এখানকার মাটি, বুক ভরে যায় কান্নায়—যেন জোয়ারের নদী। বলেছি বিমানকে—তাই সে এত নরম আর অসহায়।

নদীর দেশতো পাঞ্জাবও। কিন্তু দেখ, জীবনের সব সত্যই যেন সেখানে রূঢ়, পাথরের মত শক্ত। ধূ ধূ করে এসে লাগে মরুভূমির বাতাস, বর্ষার চিকনধারা কশ্চিৎ নামে সেখানে, রোদে চোখ ঝলসে যায়, গরমে মুখ পুড়ে ফোস্কা ওঠে। শক্ত বাজু বাঁধা হাতে মেয়েরা সে দেশে হামানদানিতে গঁহু পেষে। জৈঠ মাসের চামড়া সেঁকা রোদের দিনে লস্‌সী থেকে ননী টেনে তোলে।

আমি তো সে দেশেই জন্মেছি, সে দেশের মেয়ে আমি। বাবা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন উত্তমা। আমার মুখে চোখে নাকি সেই উত্তম লক্ষণ ছিল যা নিয়ে মেয়েদের গৌরব হয়, সুলক্ষণা বলে পুরুষদের প্রশংসা পায়। তবুও সেই দেশের কঠোরে কোমলে আমার হৃদয় বুক একদিন পুরু হয়ে উঠল, ধুলো জমল; পাথরের রূঢ় বোঝার এক বোবা সখ্যতায় কঠিন হয়ে এল আমার মন! ভাবছি আর ভেবেছি, এই কি আমার সব পরিচয়। হবেও বা, নইলে অবিশ্বাসের হাসি এতখানি নির্লজ্জ হ'ত না আমার যখন বিমান

বলত—উত্তমা, তুমি সুন্দর, হলেই বা উত্তর ভারতের মেয়ে তুমি, কিন্তু বাঙলা দেশের মেয়ের চেয়ে একটুও তো কম সুন্দর নও। কবিতার আবেগ আসত ওর স্বরে যখন ভীরু অন্তরঙ্গতায় বলত—তোমার চোখ ছুটো দেখলে মনে হয় সেরা শিল্পীর হাতে আঁকা ছুটি চোখে আলো জ্বলেছে, কি চোখ তোমার, কি চিবুক, কি ঠোঁট—আর, আর আয়নায়ও তো তাই দেখি। এই সলজ্জ স্তুতির ভীরুতা আমাকে অহরহ কেবলই ব্যঙ্গ করে। তাই হাসি—বিমানের কথা শুনে হাসি—বিদ্রূপের পিঠে বেদনার নীল আঁচড় কেটে রাখি। মনে মনে বলি, এর সবই মিথ্যা। বিমান, তুমি বি, টি, ক্লাশের কন্দর্পকান্তি ছেলে, বিছায় তুমি কারও পিছনে নও, তবু না, তোমাকে আমার আজ আর কিছু দেবার নেই, কিছু না। বিমানের বয়েস হয়েছে, কিন্তু ওকে শিশুর মতই অসহায় মনে হয়েছে ওর কথায়।

পিয়ন এসে কড়া নাড়তে ইজিচেয়ার থেকে উঠে এলুম, চিঠিটা নিয়েছিলাম হাতে, খেয়াল ছিল না কখন পিয়ন চলে গেছে। মা গো, রাস্তায় যে কাকের পাল জুটেছিল! চেয়ে দেখি একটা মৃত কাককে ঘিরেই ওদের এই অশান্ত তৎপরতা। মৃত্যুকে নিয়ে এ কী শোক না সমারোহ! এক দৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছি আর ভাবছি। মৃত্যু কী অমেয়, জীবনের অস্থির ভাবনাতে ওতঃপ্রোত এক স্মৃতি স্রোত? আর সময়—সময়টা উপন্যাসের মত বিলাসী! সেই বহুপঠিত উপন্যাসের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কাহিনীর ছেদ পড়ে না কি?

সানিপার্কের রাস্তায় নরম আলো নেমে এল, আপেলের সবুজ ঈষৎ লালাভ সে আলো। কতকাল গৃহ থেকে দূরে রয়েছি, এই সব সন্ধ্যাসন্ন ক্ষণে গৃহপ্রত্যাশী মন কেবলই আমাকে উতলা করে। বাবা বুড়ো হয়েছেন, উত্তর ভারতের সেই অখ্যাত গাঁওয়ের মেটে পথে

গায়ে জোব্বা হাতে লাঠি নিয়ে এখুনি হয়তো বেড়িয়ে ফিরছেন তিনি। বিধবা কাকিমা রোদে দেওয়া লঙ্কা আদা রশুনের বোয়াম ভর্তি আচারগুলি তুলে এনে রাখছেন পূবের ঘরের ঘুলঘুলিতে।

পূবের ঘরটা ছবির মত আজও চোখে ভাসে। মনে আছে সেই ঘরটায় আমার মার গওহানা অর্থাৎ বিয়ের দিনে পাঠানো সেই চিত্রী করা মাটির জালা দুটো সাজান ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত সে জালা দুটো ছিল। সে ঘরে সত্যনারায়ণের পূজার শিরনী আর ধূপের গন্ধ জেগে থাকে পূর্ণিমা কেটে যাবার পরেও অনেক, অনেক দিন পর্যন্ত। তারপর অমাবস্যার রাতে আমাদের উঠোনে আতা গাছ-গুলির পাতার ফাঁকে ফাঁকে যখন সহস্র জোনাকির দ্বীপ জ্বলে উঠত তখন মনে হ'ত দেওয়ালীর দিন আসতে বুঝি খুব দেরী নেই, দেরী নেই এই আশ্বিন মাসের আর এক কৃষ্ণাতিথির। মা আমাকে জরির চুমকি বসান সাড়ী দিতেন, রূপোর মল আর সোনার বাজু। ঝুম ঝুম করে বেজে উঠত আমার চঞ্চল পায়ের মল আর খুসী। চুন্নী মুন্নীদের সবাই জড়ো হলে—এপাড়ার ওপাড়ার যত ছেলেমেয়ে, আতস বাজীর মত জ্বলে উঠত আলো আর উৎসাহে, কি যে ভাল লাগত সেই সব দিন। আজ আর তার এক কণা আস্বাদও পাবার নয়। আর মনে আছে এক অমাবস্যার আকাশে অনেক তারা জেগেছিল, আর শিশির ঝরেছিল শীতের ঝিঁঝি ডাকা রাতে। সেই পূবের ঘরে যেখানে কাকীমা আচার তুলে রাখেন, যেখানে সত্যনারায়ণের জন্য দুধ আটা গুড় দিয়ে সিরনী গোলা হয় সেখানে মা একদিন ঘুমিয়ে পড়লেন, আর জাগেন নি। তারপর তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল, আর মাকে দেখিনি; কেঁদেছি আর কেঁদেছি, আর দেখেনি তাঁকে।

সেই ছেলেবেলা মাকে হারানোর শোকটা অবুঝ ছিল, পারাপারের নিঃশব্দ উতলে স্মৃতির শান্ততায় লীন হয়ে আছে তা।

সে সব ছোট বেলার কথা। যা দেখিনে, বহুদিন দেখিনে যাকে তার অভাবটা আর অভাব বলে মনে হয় না। বড় হয়েছিলেম লাহোরে, লাহোরের শহরতলীতে ছিল আমাদের বাসা। সেখানে সেই বাড়ীর জমিদার পাশের বাড়ীটায় থাকতেন, তাদের বাড়ীতেই খেলাধূলা করতাম।

ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছি এই সানিপার্কের বাসার বারান্দায়। আমার চুল এলান পিঠে এলোমেলো। পড়ন্ত রোদ, বিকেলের ছিম ছিমে রোদ এসে পড়েছে পশ্চিমের ঝিলমিল দিয়ে। যেন সহস্র চুমোর আবেগের মত তারা আমার শরীর বেয়ে চুমিয়ে যাচ্ছে আমার কপোলে চোখে মুখে। ঝির ঝিরে বাতাস বইছে, আমার বাড়ীর সামনে কিশোর দেওদার গাছের পাতায় তার সাড়া জাগছে। পাখীরা সব একে একে ঘরে ফিরছে। হাতের পুঁথি হাতেই ছিল, মনস্তত্বের একটা পুঁথি পড়তে পড়তে কখন উন্মনা হয়েছি।

মনে হল আমি যেন কিশোর জগতে আবার সেই ছোট্টটি হয়ে ফিরে গেছি। ঐ যে ওখানে ছোট মেয়েটি তার দুটো চিকন বেণী দুলিয়ে খেলছে তারই মত খুসীতে উচ্ছ্বল, শরতের বেলা শেষের রোদের মত নরম ছায়ার আলোর খুসীতে বল্গা বিহীন টাট্টুর মত লাফাচ্ছে, দোল খাচ্ছে, ঘাসের উপর উবু হয়ে পড়ছে ওরই সমবয়সী কিশোরী কিশোরদের সঙ্গে—আমিও যেন ওদের মধ্যে মিশে গেছি, কিশোরী উত্তমাও অস্থির চঞ্চল হয়েছে। মাধবীলতার মত মৃদু সাদা গোলাপের গুচ্ছে একরাশ কিশোর দিনের হাওয়া লেগেছে।

মনে পড়ছে নওল কিশোর নাম ছিল তার। আমার গালটা ধরে বলেছে—আমাকে খেলা থেকে বাদ দিও না উত্তমা। ওর বাঁ পাটায় কিছু ত্রুটি ছিল, দৌড়তে একেবারেই পারতো না। তবু উৎসাহের সীমা নেই। খেলায় সে সবার পিছনে হলেও স্কুলে ছিল সবার আগে। আমার চেয়ে বয়সে এমন কী আর বেশী, ওর যখন বারো আমার তখন দশ। কিন্তু ও তখন নাইনথ ষ্ট্যাণ্ডার্ডে আমি সিক্সথে। ওর পায়ের ত্রুটি ছাড়া ওর মত ঝকঝকে চেহারা দেখি নি। চোখে মুখে যেন কচি বাঁশ পাতার মত ধার, চিকন—অমন রঙ আমি দেখিনি কোনও পুরুষের মুখে, অমন চোখের মায়ার সেই ঔজ্জ্বল্য আর ওর ওই বয়সের সেই কথার ধার ঠিক যেন নতুন ব্লেডের মত চকচকে শানিত।

বলত—উত্তমা, তুমি রাণীর মত সুন্দর। আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চল, খেলায়, মাঠে তোমার কথায় গল্পে।

—তুমি ছেলে, তুমি কেন মেয়েদের দলে আস। সবাই তোমাকে নিয়ে যখন তামাসা করবে, যখন একটি মেয়েলী ছেলে বলে উপহাস জানাবে তখন কি যে খারাপ লাগবে, বলতাম আমি। এ সব বলেও নওলকে ফেরাতে পারি নি কোনও দিন।

নওল বলত—তুমি তো বল না, তুমি তো ঠাট্টা কর না, তা ছাড়া তুমি যে রাণীর মত সুন্দর, সুন্দর তোমার চুল আর চোখ, তুমি যে কেবল ভুলে যাও এই পৃথিবীর আর এক দেশে রয়েছে তোমার দেশ। তুমি তো ওদের কেউ নও। তুমি আর এক আকাশ গঙ্গার সীমান্তের মেয়ে, সে দেশে ঝরণার নিচে নুড়িগুলি পর্যন্ত তোমার জন্যে উতলা হয়েছে, হরিণগুলো তাদের চঞ্চলতা ভুলে গেছে, তোমাকে না দেখে বসন্তের বাতাস গুমরে গুমরে আরো দূরে তোমাকে খুঁজতে চলে

গেছে, গাছের সবুজ পাতাগুলো হলুদ হয়ে গেছে ব্যথায়, অজস্র রাশি রাশি ফুল ঝরে গেছে অকালে, তাদের পাঁপড়িগুলো ভেসে এসেছে বিপাশার স্রোতে।

ওর কথা শুনে চোখ বড় করে বলেছি—রূপকাহিনীতে পড়েছ তো, সব তোমার কণ্ঠস্থ! আমাকে নিয়ে তোমার এ রূপকাহিনী, সব বানানো। গম্ভীর আমার মুখ আর অপরাজিত এক হাসি তখনও আমার ঠোঁটে লেগে থাকত। হায়রে, সে রূপকথার সত্যটুকু আমাকে লুব্ধ করেনি! বলেছি—তুমি যাও, আমার বেলা বয়ে গেল। দেখছ না, সাথীরা দাঁড়িয়ে। যাও, এখন তুমি চলে যাও, নওল। কে জানতো তারই মুখের কথা তার চোখের আলো আরও আরও অনেক দিনের সাঁঝ সকালে সাড়া জাগাবে। আমাকে উতলা করবে।

—যাও আর যাও, পরীক্ষা তো আমারও আছে! বিকেলে এই একটু এসেছি আর অমনি তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ, উত্তমা!

বইয়ের থেকে মুখ তুলে দেখি, না নওল নয়, বিমান। সন্থ-ভাঙা পাঞ্জাবী আর ধুতিতে শুভ্র। চুল পাট করে ফেরান, ব্রাস করা। দু চারটে চুলে যে পাক ধরেছে তা ওর এই সন্থ কেশ বিন্যাসেও ঢাকা পড়েনি। বিমান এম, এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ। সরকারী স্কুলের কাজে বহাল হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। চাকুরীতে উন্নতি হয়নি, এখন এসেছে এম, এড্ পরীক্ষা দিয়ে চাকুরীর উঁচুকেতার আর এক ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে। বিমান আজও বিবাহ করেনি। কি জানি কেন মেয়েদের বেলায় যেমন ছেলেদেরও তেমনি বেশ একটা সংখ্যক এই শিক্ষকতার কাজে এসে বিয়ে করতে

ভুলে যায়। কারণটা শুধু কি অর্থনীতিক না অন্য কিছু? পাঁচ ঘণ্টা চিৎকার করে এক বিষয়ে দৈনন্দিন গ্রামোফোন রেকর্ডের মত শিক্ষকদের মনটা একদিন যন্ত্রের মত বাজতে থাকে। তারপর মনের অবকাশ থাকে কি বিয়ে যদি না করে থাকে তবে বিয়ের কথা ভাববার?

বই থেকে যখন মুখ তুলে দেখলাম বিমান, তখনও আমার ঈষদ্‌স্ফুরিত ঠোঁটের এক কোণে 'এখন যাও' কথার শেষ সঞ্চার লেগে ছিল।

কারা ছিল আমার সামনে সেই কিশোর অস্তিত্বের প্রতিভাসে, কোন বিস্মৃত কালের উদ্যানে ফোটা চম্পক সোনার কিছু আভা তার গন্ধ জড়িয়ে কি যে আমাকে উতলা করে? এই শরতের শেষ বেলায় সে স্বপ্নকে তবু যে অনায়াসে আবার সেই কালে থুয়ে এলাম, সে শুধু একালের না-দিয়ে ঘেরা উত্তমাকে দিয়েই সম্ভব। এই তো আছি স্থবির বটের মত, অনেক কালের জীর্ণতা আমার পাতায়। অস্থির উল্লাসে আমার সাড়া নেই, আমি আমার সমস্ত অস্তিত্বে ক্ষণিক। অনেক জন্ম মৃত্যু, মৃত্যু জন্মকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বিনাশে উৎপত্তিতে এক ক্ষণিকতা আমাকে নিবৃত্ত করেছে। আমার ত্বকে ত্বকে প্রৌঢ়তা, আমাতে কোন স্নেহ নেই, না মমতা বন্ধন।

বললাম, বিমানের কথায় হাসতে হাসতে—না, না, এস, তোমাকে তাড়িয়ে দেব কেন—তুমি এসেছ জেনে বলিনি। ভেবেছিলাম কি ঝি এসে বুঝি রান্নার কিছু ফরমায়েস চেয়েছিল। ওঃ, রোজ বিকেলে এই এক ঝামেলা। দিদিমণি আজ কোর্মা রাঁধ, আজ বিরিয়ানী, পোড়ার-মুখী আমাকে একেবারে মোগল দরবারের বিবি ভেবেছে?

বিমানের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম একটু। বিমান আমার কথা শুনে উচ্ছল হয়ে হাসল। শান্তিনিকেতনে সেবার পৌষের মেলায় কেনা মোড়াটা টেনে নিয়ে বসল। বললে—তাই বল, ভেবেছিলাম আজ বুঝি গলা ধাক্কা দিয়েই তাড়াবে।

বিকেল হলে আমার রোজই কেমন জ্বর জ্বর লাগে। বিকেলের পর জ্বরের মত বিমানের আসাটাও অনিবার্য। জ্বর আসা আর বিমানের আসা দুটোই যেন প্রত্যাশার মত, উদ্বেগের মত, কেউ না এলেই মনে হয় পৃথিবীটা প্রত্যয়হীন। তখন অন্ধকারে খাটে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকি, ঘুম আসে না। ভোরের পাখী না ডাকা পর্যন্ত মনে হয় আমি নেই, ছিলাম না কোনও দিন এই পৃথিবীতে—যেন আকাশে বাতাসে আমার মনের স্পর্শ লাগেনি—হাটে মাঠে লোকালয়ে আমার পায়ের চিহ্ন পড়েনি।

বিছানা ছেড়ে উঠি। অস্থির অস্থির। মৃত্যুর মুখোমুখি অন্ধকারে বসে থাকি। স্মেলিং সল্ট নাকে চেপে ধরি। ঘুম পাড়ানী ট্যাবলেটের আধখানা ভেঙে গালে ফেলে দি, জল খাই। এমনি রাতের পর রাত শত শত কফিনে আমার অনেক মৃত্যু অন্ধ গুহায় মুখ লুকিয়ে আছে।

বিমানের হাতখানা আমার দিকে প্রসারিত হ'ল, কাঁপা আঙুল মনের আবেগের মত মৃদু উত্তাপে আমার কপাল ছুঁয়েছিল, বললে—আজ জ্বর নেই তো।

বললাম—এখন নেই।

সেদিনের ডাকে আসা চিঠিটা বিমানের হাতে তুলে দিলাম।
—দিল্লীর কলেজ থেকে এসেছে, কাজে যোগ দেবার চিঠি।

কেমন যেন ব্যথায় ম্লান হয়ে গেল বিমান, আলো নিভে গেছে ওর চোখের। বললে—যাবেই।

—যাব।

—কেন? কিছুতেই কি এই সংকল্প ফেরাবে না।

—না।

—কেন?

—জানি না।

বিমান আমার মধ্যে কি খুঁজেছে, কি সে চায় সে কথা বুঝেও বুঝিনা। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালা হয়নি। বাইরে থেকে যতটুকু আলো এসে পড়েছিল তারই মৃদু অভাসে টি পয়ের দুটো ধোঁয়ান চায়ের কাপ চোখে পড়ল। ঝি এসে চা দিয়েছিল।

—চা জুড়োল, চা খাও, বিমান।

এমনি আর একদিন নওলকে মনে হত কে যেন ওকে আঘাত করেছে, কে যেন ওকে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা দিয়েছে। যে ব্যথায় সে সবার থেকে দূরে চলে গেছে অভিমানে, নিজকে নিয়েছে আড়াল করে। ডেক চেয়ারে বসে ও পরীক্ষার পাঠ না পড়ে ইংরাজী কবিতায় ওর মনের নির্জনকে ভরে তুলত। তখন ওর বয়স কুড়ি বছর। কিন্তু কী ছেলে মানুষ দেখাত ওকে। বাঁশ পাতার মত চিকন শ্যামল ওর মুখ। কাছে যেতাম যখন তখন বলত—জান আমরা আর কোনও দিন আমাদের শৈশবকালে ফিরে যেতে পারব না। মনে আছে তুমি ছিলে আমার রূপকাহিনীর রাণী।

আমার বয়স তখন আঠারো—সারা দেহ অভাবনীয় রূপে নূতন হয়ে উঠেছে, সেই কিশোরী উত্তমার ছোট এলান বেণীর বদলে বাঁধা হয়েছে খোঁপা, সালোয়ার বদলে গায়ে উঠেছে সাড়ী, দেহের

তটে ঝির ঝির ঝরণার চঞ্চল উচ্ছলতা কখন হারিয়ে গিয়ে নেমেছে আঁকাবাঁকা নদীর একান্ত স্রোত।

এই তো আমি উত্তমা আমি তোমার রাণী, এই ঝিলমের দেশের এক নদীর মত। কিশোর সূর্যের আলো পেয়ে সে দেশে ফুল ফোটে, গান জাগে, হাওয়া বয়। এ কথা আর বলা হয়নি। একদিন সকালে সেই সবে সূর্য উঠেছে। চন্দ্রমল্লি ফোটা বাগানে শীতের শিশির জেগে ছিল। নওল একটি মল্লি আর একটি গোলাপ এনেছিল। একটি শুভ্র মমতায় অনুচ্চার ভালবাসার মত নীরব আর অন্যটি যৌবনের রক্তিম উচ্ছ্বাসে উতরোল।

—উত্তমা, সেই আমার সকাল বেলাকার উপহার মনে আছে? পরে যখন আমরা লাহোর থেকে চলে আসি, নওল লিখে জানিয়েছিল। আজ কি অদ্ভুত আশ্চর্য লাগে ভাবতে কেন যে আমি গোলাপটি নওলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম আর মল্লিটি এনে রেখেছিলাম গৃহকোণে ফুল সাজান ভাসে। সাজিয়েছিলাম হৃদয়কে আমি নীরব ভালবাসা দিয়ে, সুন্দর কমনীয়তায় মল্লির প্রশান্ত আলোতে আমার হৃদয় ভরেছিল।

নওল কতদিন চিঠিতে লিখেছিল—কতদূর গ্রামে ওর খোঁড়া পা নিয়ে সে হেঁটে চলেছে—গ্রামোন্নয়নের কাজে সে আত্মনিয়োগ করেছিল। সে লিখেছিল,—গোলাপের রক্তিম উচ্ছ্বাসটা আজ কত বিবর্ণ মনে হয়। মনে হয় অগণিত উপোষী স্বল্প পরিচ্ছদে আশাহীন অক্ষর-অজ্ঞ মানুষের পরবশ্যতায় হৃত-সম্পদ এই দেশটা সব কিছু থেকেও যেন আমার খোঁড়া পায়ের মত। খোঁড়া পাটা জোড়া লাগবে না কোনও দিন জানি কিন্তু একথাও জানি, সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করি, বিশ্বাস করি, যদি হৃদয়ে প্রেম থাকে ঝিলমের নদীর মত অবাধ

খরস্রোতা, তাহলে একদিন না একদিন তার দুই তীর শ্যামল হয়ে উঠবেই। চলেছি নদীকে মেলাব মানুষের জীবনে, তার দুঃখে সুখে অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যে নদীকে বেঁধে দেব আমার প্রেমে, সে সেতুবন্ধে গোলাপের রক্তিম উচ্ছাসে নিজেকে মিলিয়ে দেব দ্বৈতে।

বিমান চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। বললে—ভাবিনি তুমি আমাকে এমন নিরাশ করবে, ভেবেছিলাম তোমার কাছে আছে আমার আশ্রয়, বন্ধন। মাথা নিচু করে বিমান কথাগুলি বলেছিল।

না, আমাতে কোন আশ্বাস ছিল না, নিরুত্তর আমি। থর থর করে উঠল আমার সমস্ত শরীর। মৃত্যুর মত নিস্পন্দ আমার মন, কালের সাড়া জাগে না আর। ভুল ভেবেছ বিমান, আমাতে গোলাপের রক্তিম উচ্ছাস আর অবশিষ্ট নেই। কবে কোন দুরন্ত দুপুরে সে নিঃশেষ হয়ে গেছে, ঝরে গেছে ঝিলমের স্রোতে। নিস্পত্র গাছেও ঋতু ফেরে কিন্তু আমাতে তা আর সম্ভব নয়—নদীর দেশের কালস্পর্শহীন রাণী হবার। অস্ত দিনের সূর্য কি আর ফেরে?

রাত্রি মৌনতর হল। অন্ধবলয়ে বিলুপ্ত হল সমস্ত আবেদন। বিমান চলে গেল। রাস্তার গ্যাস বাতিতে তাকে বহুদূর পর্যন্ত চলে যেতে দেখলুম, দেখলুম তার শুভ্র পঞ্জাবীতে বেদনার এক আতপ্ত স্পর্শ গ্যাসের আলোয় কেঁপে উঠছে, কেঁপে উঠছে নীল আকাশে শেষ অগ্রহায়ণে টলোমল শিশিরের অন্ধবিলয় নিদ্রাহারা স্বপ্নের অনেক তারা, অনেক দূরের এক আকাশ।

তার পরদিনও ভোর হল, কাক ডাকল। ট্রাম বাসে ভীড় করে যাত্রিরা এল গেল। আজ আর ট্রেনিং স্কুলে নয়। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সেদিনও খেলা করেছিল। উত্তমা সেখানে নেই। সে

ছিল একদেশের রাণী—এসেছিল অন্যদেশে। আর তার নিজের দেশের রাণীকে না দেখে হরিণ তার পায়ের চঞ্চলতা হারিয়েছিল। ঝরণার নিচে নুড়িগুলি উতলা হয়েছে তাকে না দেখে। বসন্তের বাতাস গুমরে গুমরে আরো দূরে তাকে খুঁজতে গেছে। গাছের পাতা হলুদ হয়েছে ব্যথায়, রাশি রাশি ফুল ঝরে এসেছে ঝিলমের স্রোতে।

আজ আর রূপ কথা শোনাবে না উত্তমা তোমাদের। বিদায়—

* * * *

দিল্লীর আকাশে বর্ষা। সে দিন ট্রেনে আসতে সারা পথ সূর্যের মুখ দেখি নি। দূর থেকে স্টেশনের আলোগুলি বড় স্থির নিষ্প্রভ দেখিয়েছে। প্ল্যাটফরমে কিছুদূর এগুতেই এক টাঙ্গাওলা আমার হাত থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে বললে—আমার গাড়ীতে চল মেমসাব, এদিকে আমার গাড়ী। টাঙ্গাওলার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখের আর পাতা পড়ল না। এ মুখ আমার এত চেনা, একে যেন কোথায় বহুদিন ধরে দেখেছি—কোথায় দেখেছি? চলতে চলতে বললাম—তোমাকে অন্য কোথায় দেখেছি, এর আগে তুমি কোথায় ছিলে বল তো?

টাঙ্গাওলা আমার কথা শুনে যেন বিরূপ হল কিম্বা মুখের স্বাভাবিক বিরক্তি নিয়েই সে আমার কথা না শুনে এগিয়ে চলছিল।

গাড়ীর কাছে এসে পৌঁছলাম।

—দিল্লীতে কতদিন আছ, তোমার মুখের সঙ্গে আমার দেখা আর এক মুখের এত মিল, টাঙ্গাওলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছিলাম।

হঠাৎ টাঙ্গাওলা ফিরে দাঁড়াল। বললে, না না আমাকে কোন

দিনও দেখনি, না, দিল্লীতে আমাকে কেউ জানে না। হঠাৎ চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে নামল। কান্নায় সে নতমুখে বললে, লাহোরে ছিলাম আমি যুগলকিশোর—তবে সে মরে গেছে।

শেঠ চাচা—বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে টাঙ্গাওলার হাতের ব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, দিলেন না। বললেন, তা কি হয়—আমি এখন টাঙ্গাওলা, এই আমার কাজ। কান্নার আবেগ আর নেই, স্থির ভিজে দুটো চোখ তাঁর অন্ধকারেও উজ্জ্বল, বড় শান্ত।

টাঙ্গায় উঠে ঘোড়ার পিঠে জোরে চাবুক কষিয়ে দিলেন। আরো কিছু যেন বলেছিলেন, এক ক্রুদ্ধ আক্রোশ তাঁর স্বরে—বেইমান দুনিয়া! দাঙ্গায় সব খতম করে দিলে—দিক্, আমরা এই মুসাফিরা নিয়েই বাঁচতে হবে উত্তমা। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা যায় না। কিছু ভাববার চেতনাও আমার ছিল না। নওলকিশোরের ধনী পিতা আজ টাঙ্গাওলা! চাকার ঘর্ঘর আর অশ্বখুরের শব্দে ভারী মুহূর্ত-গুলো সরব অনুনাদের পেষণে আর্ত হয়ে উঠল, কিছু শোনা যায় না। একটা শব্দের যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু না। চিৎকার করে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করেছিলাম: বাড়ীর আর সবাই কেমন আছেন।

—দেশ ভাগ হবার আগে দাঙ্গায় তো সবাই খুন হয়ে গেছে।

—নওল?

টাঙ্গাওলা বোধ হয় আবার কেঁদে ফেলেছিল, ঘোড়ার পিঠে চাবুকের শব্দ অশ্বখুরের তাড়না অরব কালকে আর একবার জাগিয়ে তুলেছিল।

—না, সে নেই।

অচির

বুদ্ধিতে বৌদ্ধ আবেগে বৈষ্ণব কামে নাগরী—এই সে।

যে সব দিনে ওর মাথায় একরাশ কালচুল পাট ফেরান ছিল তদোধিক উজ্জ্বল ছিল ওর চিকন বাঁশ পাতার মত ধার দেওয়া কচি মুখের আশ্চর্য আশ্চর্য হাসি তখন থেকে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরিচয় কৈশোর পেরিয়ে যৌবন ডিঙিয়ে প্রৌঢ়ী সমচারী সাযুজ্যে এতাবতকাল অটুট থেকেছে।

অলডাস হাকসলির মত চোখে চশমা পোষ্ট গ্রাজুয়েটের ফ্রককোট মানুষটি—অতি পড়ুয়া বলে খ্যাত ছিলেন। হৃদয় ঘোষালকে মনে করলে তাকেও মনে হত—নাম তার রাতুল গুপ্ত। আর একজন।

গোল্ডেন বাউ থেকে এলিয়ট, এঙ্গেলস থেকে আর্ল ব্রাউডার, কেনস, জি বি এস, জয়েস, পৌণ্ড, ঠোঁটে নিয়ে আর হাতে পুরণো ইয়াঙ্কী ইয়ার্কীর উলঙ্গিনী বিদেশীনিদের চটুল ছবির ম্যাগাজীন বয়ে বেড়াতেন এমন কেতাবী যশ যার সেই অসিত ধরও শোনা গিয়েছিল না কি লা আঁতেলেকচুয়াল! ১৯৪৭ এর দুরন্ত দুপুরের ঘাস ওঠা পোড়ো মাঠ ডিঙিয়ে হঠাৎ একটা বট বৃক্ষ যেন কফি হৌসের থমকানো রোদের ছায়া, সেখানে মৌচাকের গুঞ্জন গুনে বিপ্লব প্রেম প্রাজ্ঞতায় প্রায় সারা পৃথিবীটা নিংড়ে ছাকনির মত কফির তেতো স্বাদে তারা ঠোঁট বাঁকিয়েছিল। তিরিশ তখনো পেরোয় নি—অতএব কোমরের দৈর্ঘ্যে তাদের স্ফীতি নেই। অপবাদে নিরঙ্কুশ হয়ে যে রেনিগেড—পাকিস্তানের স্বাধিকারকে মুসলমানের দ্বিজাতি তত্ত্বে কিছুতে তবু বুঝল না। বুঝল না সে একা। একা তার দেহের পশুটিকে সে আহার দেবে,

নিদ্রা আরাম রমন বিরেচন। আড্ডায়—কেতাবে, শুনত পড়ত—স্তালিন কি বলেছেন—উজবেক আজারবাইজান মঙ্গোলদের কথায়—যুদ্ধ প্রাক্কালে গান্ধীজিকে নির্ব্বিচারে ভ্রান্ত আখ্যা দেবার মত মূঢ়তা হৃদয় ঘোষালকে অতঃপর গ্রন্থাগারের অন্ধকারেই ঠেলে দিয়েছিল। তখনও রাতুল গুপ্তরা পীড়িত কুকুরের মত তবু ঝুলে রইলেন দ্ব্যর্থহীন প্রতীতিতে, তারা না প্রেমিক না বিপ্লবী, বনের বানানো ডক্টর শ্রীমান ধর যা। পড়ে রইলেন, বাঁচতে থাকলেন, দেখলেন পৃথিবীর দেহ লোল হয়ে এল। তদানীং একদিন বতিচেলির মুখ নিয়ে আঁকা—আকাশ এক মেয়ে, এলোমেলো চুলের একরাশ রহস্যে পিঠ ফিরিয়ে বসে পাতিস খেতে খেতে বর্শির মত বিঁধে গিয়েছিলেন হৃদয়ের চোখে। সেই কফি হৌসে দেখা একদা।

তখন রাতুল বা ধর কথিত ব্যক্তিরা বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন ইনটেলেকচুয়ালদের তালিকা থেকে—কেননা রাতুল গুপ্তটি যেমনই হ'ন না তেমনি—বিজ্ঞাপনের সদরে তার যত আদর অন্যত্র তিনি কিন্তু মিথ্যা বিজ্ঞাপিত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। আরও পরে কফি হৌসে যখন তিনি ফ্রক কোট না পরে শ্যামল মজুমদারের সঙ্গে এসেছিলেন সাদা পাঞ্জাবীটিতে, তখন সেঁজার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বলেছিলেন গোপাল ঘোষের রঙকে আশ্চর্য ব্যবহার। বলেছেন ফরাসীর বুকনির বাহারে বাহবা জানাই! সার্ত্রের এর সঙ্গে একালীন সব কিছুর তুলনা পেলেন তিনি যেমন আজো এসপ্লানেডের চত্বরে চড়ুই পাখীর মত জেগে আছেন তিনি আজও আর সব কিছু।

মানুষটি ভাল। সবুজ চশমা দিয়ে সাদা কালর তফাতটা দেখেন—সুখে দুঃখের তফাতটা। কিন্তু সরিত ধর ধরা পড়ে গেলেন—বতি চেলি বিদিত বৈদ্য আভা সেন তার প্রেমের চিকিৎসা করবেন

বলে যেদিন চেম্বার খোলার প্রস্তাব জানালেন। আর এলিয়ট সাহেব কোনও দিন ধরের ধটুকুর অস্তিত্ব জানেন না যদিচ ধর বলেছিলেন এলিয়ট তাকে চিঠি লিখেছেন, এই যে—প্রিয় ধর মশাই—আমার বা তোমার যার হোক তার বিড়ালটা পোষাই—একথা সত্য নয়! সেই সব কথা তাই আভা সেনের ঝকঝকে দাঁতে উজ্জ্বল রোদ্দুর লেগে স্পষ্ট হয়েছিল—বলেছিল একটু বড় খোকার নষ্টামি তার চুলগুলোকে এমন বিমর্ষ করেছে, তার সুন্দর মুখে ধাষ্টামি—তার চিকন চোখা নাকে শৈশবের রুগ্নতা।

অমন অনন্ত অসহায়তা নিয়ে যে শিশু আশ্চর্য হ'ত নিজের বিরাটত্বে সে আদর পেতেই পারতো অবশ্যতঃ। কিন্তু হৃদয় ঘোষাল সবাইকে তদবধি বুদ্ধিতে ডিঙিয়ে গেল, লম্বায় অনেক খাটো হয়েও মাথায় বিরল কেশ সে মানুষটি হঠাৎ একদিন আভা সেনের আওতা থেকে ছিটকে এসে আইসক্রীম খাবার গল্প পাড়লে। আর বৈনাশিক স্বভাবে সে বললে—জান এই সব হলুদ বয়সের পাতা যা কিছু আমার তোমার ভাবনায়, নাস্তিতে মেলাবে তা বন্ধু। কিনা সেই বেটে খাটো মানুষটি প্রেমে পড়েছিল একদা, তারপর চিল প্রবরের মত তার মুখে তাই লেখা হয়ে গেল। বিমর্ষ দিন অনেক দিন তিল তিল করে প্রেমিক পুরুষের প্রতীতি পোষণ করেছে সে হৃদয়ে। সেই সব দিনের কথা।

সেই কথা বলি। আনেষ্ট কেসিরের কি বলেছেন—ভাষা সম্পর্কে আর আদিম মানুষদের বিবরণী বিশ্বাসগুলি সভ্যতার বনিয়াদে বেমালুম গেঁথে গেল কেমন করে কবে—বা সিভিলিয়ান গিয়ারসন ভাষা এবং গেজেটিয়রে ফনা ফ্লোরা—বিষয়ে ভারতীয় নৃতত্ত্বে কতটুকু মূল্যবান সন্ধান রেখে গেছেন, অস্তিত্ববাদী—জেসপার ঈশ্বরবাদী

হয়েও অন্যত্র সাত্র´এর ঈশ্বরহীন অস্তিত্বের একাকীত্বে কতটুকু অমিল ভাবনার কত মৌলিক সরলীকরণ হয়েছে অথবা হেগেলের মাথাটা মাটিতে আর পাটা শূন্যে কিনা সমস্ত তত্ত্বের শেষে বৌদ্ধ বৈনাশিক ভাষণকে সত্য বলে জেনেছিল হৃদয় ঘোষাল।

ঔপনিষদিক প্রত্যয়ে দুটো পা'ই সে আকাশের দিকে তুলে দেয় নি, এক পা মাটিতে এক পা আকাশে রেখে দু পায়ের চেয়ে পৃথিবীর পথকে জেনেছে অনেক বেশী। আর হুজার্লের কথায় তার মনে প্রশ্ন জেগেছে—দর্শনের আলোচ্য মূলতত্ত্ব কি একান্তভাবে কালধৃত, ইতিহাস নির্দ্দিষ্ট? বিজ্ঞানের যে নিয়ম কোনও এককালে অবিসংবাদিত পরবর্ত্তীকালে বিপরীত কোনও ঘটনার পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্রে—আবির্ভাবে এবং পূর্ব্বগ্রাহ্য নিয়মের ব্যাখ্যাপাতনে উক্ত নিয়মকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত হতে প্রায়শঃ দেখেছি। এদিক থেকে বিচার করলে বিজ্ঞানের যথার্থ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু আর্ট কিংবা দর্শনের পূর্ব্বোক্ত দ্বিধাহীন বর্জ্জন গ্রহণের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় কি? প্রতি শিল্পীর প্রত্যেক সার্থক শিল্প সৃষ্টি আপন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল এবং উত্তরকালে নব শিল্পের আবির্ভাবে তার শিল্পমূল্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়না। সেক্সপিয়রের আবির্ভাবেও গ্রীক নাটক বর্জ্জিত হয়নি, বৈষ্ণব পদাবলী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে অপঠিত থাকে না আর পিকাসোর চিত্র দা ভিঞ্চির 'লাষ্ট সাপারের' আপন বিশিষ্ট শিল্প মূল্যকে কিছুমাত্র ম্লান করে না। এইখানে আমরা পাই প্রত্যেক শিল্পীর ব্যক্তিগত সাধনার বিশেষ ধারা এবং তাঁর যুগের কোনও একটা বিশেষ ঝোঁকের স্বল্প বিস্তর প্রতিফলন। দর্শন শিল্পের মত একান্ত ব্যক্তিসাক্ষিক, এবং প্রতিটি শিল্পকর্ম্মের মত বিচ্ছিন্ন স্বকীয়তাময় নয়। তবে দর্শনের এক যুগের সত্য আর এক যুগে বিজ্ঞানের বাতিল নিয়মের মত

বর্জনের কোঠায় পড়েনা। দর্শনকে এদিক থেকে বিজ্ঞান এবং আর্টের উভয়ের বিশিষ্টতার অংশভাক অথচ নিজস্ব বিষয় বস্তুতে এবং পন্থায় স্বতন্ত্র মানব চিন্তার এক বিশেষ বিকাশ বলা চলতে পারে। দর্শনের এই মূল বিন্যাসীকরণ বিশ্লেষণ করা এবং তার নির্দ্দিষ্টকরণ শুরুতেই করতে হবে। এই সব ভাবনা আর ভাবনা।···

অতঃপর তিরিশ পেরিয়ে সে দেখলে প্রেমকে তার কোন চলার পথে কোথায় থুয়ে এসেছে ; আবেগে থর থর করে উঠল বুক, আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের বিরল কেশ মাথাটায়—আরো দুবার বুরুশ চালিয়ে হাসলে, ভাবলে রাধার মত সে অনন্ত বিরহের আকুল বাঁশী শুনেছে কোনও কোনও বকুল ঝরা সন্ধ্যায়। কে সে যার জন্যে তার অস্তিত্বের প্রতিটি তন্তু অনু অনু করে মূহুর্ত্ত গুনেছে, কে ?

রক্ত পতাকার মিছিল—আকাশে কাল মেঘের ছায়া—মেহন্নত দিয়ে মাথার বুদ্ধি দিয়ে সে খুঁজেও পেলনা স্পেনীয় সেই তন্বঙ্গীকে যার আগুন লেখা মুখের ভাষা। কেমন যেন না আর না ; মনের উত্তুঙ্গ অহঙ্কার নিয়ে তাই কাউকে বলতে পারল না—তোমাকে ছাড়া আর শান্তি নেই।

আর একদিন একান্তে বললে আমাকে, তখনও যন্ত্রণায় শাশ্বত তার মুখে শিশুর অবুঝ হাসির মত মমতা, চোখে আবেগের আলো কাঁপা অনুকম্পা, নিজেকে যা সহস্র প্রহারে জর্জ্জর করেছে সেই অস্বীকৃতি—সর্বত্র যা সে পেয়েছে তা অবহেলা বা শ্রদ্ধা, কেবল তার শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধাই শুধু করেছে—কেউ দেখেনি যৌবনের প্রৌঢ় পীড়া অনসূয়াতার অস্তিত্ব জুড়ে রইত যখন সে বলত—মেয়ে তোমার মাথার লাল ফুল, চক্ষুতে কাজল আর বাম গণ্ডে তিল—এদিকে দেখ আমার হৃদয়ের দফা গয়া—আর তোমার হৃদয়ে কে বটে প্রতিবিম্বিত হয়—

নাকী সে স্বচ্ছ ঘসা কাঁচ? হাসতে হাসতে ওর অনন্ত সারল্যের পিঠে চটুল হবার এই আত্মজিজ্ঞাসায় বিমূঢ় হতে হয়।

বললাম—কি চাও? জান তো সুখ বা দুঃখ অচির—সুখ আচরণ অসাধ্য কেননা স্ফীতোদর শূকরের বৃত্তিটার মূল্য আমরা পায়ে মাড়িয়ে চলি—দুঃখকেও মূল্য দিইনে। দেহ নামক পশুটিকে দেখনা কেমন সুন্দর করে সাজাই মানাই, নিজেদের মুখকে প্রক্ষালন করি উদরপূর্ত্তিতে তুষ্ট করি নিজেদের।

এতদসত্ত্বেও যন্ত্রণা আমাদের সকল পাওয়ার শূন্যতাকে ভরিয়ে রেখেছে—। যন্ত্রণাকে জানলে সব জানা হয়—যন্ত্রণাকে ভুলে ভুল করি। থামিয়ে দিয়ে বলত সে,—কি জান আনন্দ বলে কিছু আছে যা মৃত্যুকে জয় করে। এই দৈনন্দিন মৃত্যু এই অসহ্য শূন্যতায় ভেবে-ছিলাম জ্ঞান সেই আনন্দের দরজা খুলে দেয়। অথচ বিশ্বাস বলে বস্তুটিকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। আধুনিক কালের এই ব্যাধি বিশ্বাসোপহারক বিজ্ঞান আমি নামক প্রাণীটিকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। যারা চরম বিশ্বাসী তারা যদ্যপি মানব ধর্মের রক্তকেতন উর্দ্ধে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু তারা ঈশ্বরকে বহুদিন হল হত্যা করেছে। তাদের সৃষ্ট যন্ত্র যখন নিঃশেষে মানুষের সকল অভ্যাসগুলিকে আত্মসাত করেছে তখনও দেখি শুধু আমাদের দেহটাই ক্রীড়নক হয়নি, এক অন্ধ যান্ত্রিকতায় আত্মারও অবসান ঘটিয়েছে—প্রভুত্ববাসনা। দক্ষতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক মারণ যজ্ঞে ভয়াবহ হয়েছে ইদানীং কাল।

এ কথা থাক। ট্রাম বাস—ধূলোর রাস্তা—স্মৃতি—রেস্তঁরায় শূকরের মাংস বারের ঠাণ্ডা ভল্লুক অথবা ভেড়া—(বিয়ার বা রম নামক মদ্যকে আমরা বলি ভল্লুক বা ভেড়া, কোনটা ইচ্ছা কর—ভুলেজ ভু-ভাঁ)। বহু দূর আকাশের নক্ষত্রের আলো এসে পড়ে

আমাদের মুখে—শুকনো পাতার মত মচ মচ সাড়া জাগে আমাদের ভাবনায়। বলি—নিজেকে সকলের থেকে উঁচুতে রেখ না—যদি মন্ত পান কর তবে যন্ত্রণার দোহাই দিয়ো না, হৃদয় নামক বস্তুটিকে তাকে তুলে রাখ।

দুপুর বেলা মোষগুলি যেমন হাঁপায় তেমনি আমরা হাঁপিয়ে উঠি। চেনা মুখ দেখি, সেই সব মুখ দেখে ভেবে আমরা ক্লান্ত। তাদের নাম মনে রাখিনা তবু রাখি। বিশটা শতাব্দী আমাদের ঘাড়ের উপর। মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে ইতিহাসের কথায়। প্রাজ্ঞ যারা—অনিমেষ মিত্রের মত হাগ উনিভার্সিটির এক মাইল জোড়া ডিগ্রী নিয়ে দিল্লীর তক্তৌসে হাজার মুদ্রার বিনিময়ে হৃদয়কে ফৌত করে দিলেন। সেও তো জানি উড়োজাহাজে প্রেমকে তার ভাসিয়ে দিয়েছে যুক্তরাজ্যে। মনে পড়ছে—(চার্মিনার সিগারেট নাকি গোল্ড ফ্লেক—দাও একটা ধরাই) সিগারেটের ধোঁয়ায় তার মুখ ন্যাবা হয়ে গেল, তেতো মদ গিলে পরমহংসের মত সাত্বিক হৃদয় ঘোষাল আরও কবার ময়দানের জারুল কুড়োলেন। কাদা বেনাজলে কুচো কাঁকড়াকীর্ণ অস্থিরতায় ডুবে গেল সে।

এক ঝাঁক কাক। কুকুর আর পুরনো পেরেক গাঁথা দেয়াল—এই আমাদের অভ্যাস আর আকাশ। ডিঙোতে পায়না আমাদের পা—বৈষ্ণব পদরেণুতে যে মাটি শ্যামময়, মেঘভাঙা অত্যুজ্জ্বল আবেগের স্মৃতি যার বহুদূর বহতার স্নিগ্ধ নদী, সকালে ফোটা সোনার কনক আলো—কবেকার অস্থির দুপুরের অশ্বখুরধ্বনি উচ্চকিত সকল স্নেহের মিনতি যার অবাক হৃদয় দেখেনা, দেখবেনা। আর সেই নীল আশ্চর্য আকাশ যেখানে সূর্যমুখির হাওয়ায় আপাত বিপন্ন আলো তার যৌবনের কাজলে ডুবে আছে। নিজের পায়ের পেরেক বেঁধা ক্ষত

সারা পথ তার পদচিহ্নের রক্তে কাল, সামাজিকতার অসদদৈন্যের পীড়নে পৃথিবীর কোনও রাজকন্যের জন্যে সে আর লাল জুতো কেনার আশা রাখেনা।

মাঠের চারটে সবুজ দুর্ব্বা ছিড়ে নিয়ে সে একদা বলেছিল—এই এমনি করে আমার এক অরণ্য নিবিড় নিশীথ স্বপ্নের শস্য ছিনিয়ে নিয়েছিল সেই মেয়ে, যার বিদেশিনী বলে অনেকটুকু মায়া ছিল মনে আর যার চোখের আলোয় কীর্ত্তিনাশা নদীর নির্জ্জনে আমার একলা নৌকা ভাসানোর ছল ছল আলাপ শুনেছি একদা। তারা ভরা রাত্রির সাড়ীতে নিলীম হয়ে সে ঘুমিয়ে ছিল।

পৃথিবীর এক অরণ্য পথে যোজন জোড়া ভোরের আলোর আগমনে ডোরাকাটা বাদামী বাঘের হিংস্রতায় হিংস্রক হয়েছিল আমার অস্তিত্ব। অতঃপর সেখানে সাহারার বালুকা জেগে উঠল—তৃষ্ণার মরিচীকা স্বর্ণমৃগের মত মনে হল। এই দেখ এখানে আমার শূন্যগর্ভ মাথার করোটি, এই দেখ আমার হৃদয়ের পিঞ্জর—জ্ঞানে ও প্রেমে যারা হাজার হাজার মরণেও দেহ নিয়ে ছিল উজ্জ্বল, সময়ের শানিত নখরে এক বাঘিনীর মূর্খ ক্ষুৎবৃত্তির জঠরের অন্ধকারে উপাখ্যান হয়ে রয়েছে তারা—এই ধূ ধূ বালিয়াড়িতে উপুড় হয়ে আছে অশেষ কঙ্কাল, মাথার করোটি, শূন্য হৃদপিঞ্জর। আমার প্রেতাত্মা পিঠ ফিরিয়ে তবু হাসে।

ফিরেছি—ধ্যানের অপার তন্ময়তায় আত্মগত হবার চেষ্টা হয়েছিল ভাই। কী লাভ সে কথায়, বলতুম—চল আর কটা দিন পা দুটো চলনক্ষম থাকবে বল, যে দিন দৃষ্টি ক্ষীনতর হয়ে আসবে, দেহ লোল হবে আপনি থিতিয়ে যাব। আসবে—মৃত্যু, শেষ যখন অবধারিত, প্রেমের অনাত্মস্ত অবকাশ যখন ফুরোবে—তখন থামব।

আপাততঃ এই হব বা হইনা নিয়ে দ্বিত্তচারণের কারণ শেষ করে দি এস। পায়ে হেঁটে চল আমরা বৈতরণী পেরুই। মরা নদীর খাল—ময়লা আবিল স্রোতসহা নদীর উপর মুখ দেখি। স্নেহ—অমৃত আস্বাদের শিশু ঝাউ তখনও কেঁদে ওঠে।

মাকে মনে পড়ে; আমার মার মতই তাঁকেও দেখেছি বৈষ্ণবের আত্মসমর্পিত ভক্তি সেবায়। তাঁরই হাতে মানুষ হৃদয়—ভয় পায়। অহঙ্কারে অভিমানে বাজ পাখীর মত পায়রার মত টিকটিকির বাঁকা লেজের প্রায় চোখ করে পুঁথী পড়ে। পৃথিবীতে এসে কি গভীর লাভ হল—যদি সে আবার মাতৃগর্ভে ভ্রূণের মত ঘুমিয়ে পড়তে পারত তবে? অতীত তার বর্ত্তমানের আয়না—তারই দূরায়ত আলো নিয়ে মনে করলে—তবে······

তবে সেই চাঁদপুরের মুসলমান সদাচারী মানুষটি তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কা আর অত যত্ন আত্তি করে মানুষের আবেগকে সূর্য্যের আলোর পথে যাত্রা করে দিতে পারত—আমসত্ব আর দুধ খাইয়ে তার জমিদার দাদু তার পেট রোগা পেটকে স্নেহের অবিচারে কি এত অপর্য্যাপ্ত খুসীর কথা মনে করিয়ে দিতে পারত। ছোট বেলা নিয়ে এত গৌরব তার কণ্ঠ লগ্ন হয়ে এত বয়সেও উজ্জ্বল মুক্তো হয়ে আছে।

সেও দেখেছে—কাদের নৌকো যায় গাঁয়ের ধার দিয়ে, নৌকো বাঁধ—তার দাদুর হুকুম। —কী বললে বিয়ে করে চলেছে পরশু-রামের ঘোষালের ছেলে। আসুক ওরা এখানে, আনুক দশটা ইলিশ, সাগর দই, আধ মণ দুধের ক্ষীর। মাঝি নিয়ে পাঁচজন, পাত পড়ল হৈ হল্লায় অনেক জনমের কুটুম্বের গল্প শেষ হল, আবার নৌকো

চলে গেল, ছল ছল শব্দের ঢেউ—কৃতজ্ঞতার সরব চাউনিতে আতিথেয়তার অনেকগুলি পদ্মের কোরকে আলো হয়ে রইল।

সরাল হাঁসের ঝাঁকে গুলী বিঁধে গেলে যেমন রক্তের ঝলকে রোদ্দুর লাল হয়ে চমকে ওঠে, পথ চলতে চলতে সে তেমনি কেঁপে ওঠে—এই আমার বাঙলা দেশ, কাশ বনের বৈধব্যে যে বিধুরা হয়ে জেগে থাকে তার পথ হারান ছেলেদের জন্যে করুণ উদ্বেগে! সেই সব লক্ষ মানিকজ্বালা দিন; আঃ সেই সব দিন মায়ের স্নেহের মত তাকে লুব্ধ করে, হাত ছানি দেয় পরম নিশ্চিন্ততার ঘ্রাণে।

আপাততঃ তোমার হৃদয়ে কে, কার মুখ—বন্ধু? তবু সে বলত—কে কাকে নিয়ে তোমার অনুরাগ স্বপ্ন রাত্রি দিন চলা? কখনো সন্ধ্যায় সামাজিক চা গলাধঃকরণ করে কৃতার্থ হয়ে ফিরি আমরা, মরা ইঁদুরের মালিক যেন—ছোঃ ছোঃ—এতে ব্যবসা ফাঁদবো না কি—? —আমরা যারা ফরাসী দেশে না গিয়েও পিকাসোকে দেখেছি, টুলুস লোত্রেকের রঙীন ছবির মত বিজ্ঞাপিত হতে চেয়েছি রক্তের নীল উচ্ছ্বাসে—মার্সেল প্রুস্তের মত গোপ্যণীয়তা মনে রেখে দুর্বোধ্য স্বভাবে—তাই এই দেহটাকে সাজিয়েছি ট্রাউসারে—রপ্ত সন্তরে বিদ্যায়, এক পয়সায় বৈতরণী পেরিয়ে এক রাশ দেহের হুঙ্কারে সমাজ টাকে ব'ড়ে খেলতে দেখে পশুর মত লাগাম খুলে দি, পাপের পাপোষে আমাদের মিথ্যা আচারকে মাড়িয়ে দিতে মরণ প্রয়াস করি।…

মনে আছে সেদিনটা ছিল রাত যেন কঠিন এসফালটের গলা পিচ পিচ্ছিল—গলিত শবের উদ্বায়ু পীড়ায় পণ্যা মেয়েরা ইতি উতি জোনাক পোকার মত জ্বলছে—চীলের চিৎকারের মত তাদের হাসি পিঠে এসে বেঁধে করুণায়। ক্লান্ত—ক্লান্ত পা দুটো ধানভানা কলে ঝাড়ুনি কুলোর মত কর্ম্মরত ক্ষুৎ নির্ণয়ে নত হয়ে আছেই—এই কামনা

কাম, বাসনা ঘরভাঙা, শূন্যতার অন্ধ অতল খাদ—আমাদের পা—যার নিচের নরম ঘাসগুলিকে আমরা হৃদয়হীনভাবে মাড়িয়ে চলেছি।

উপন্যাসের সতীর মত ব্যর্থ গল্প নিয়ে যারা আমানি ভাত জুটোতে দেহটাকে আমসির মত শিকারের হাতে তুলে দেয় তারা এই সব হতাদর মানুষের মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। মাথা নিচু করে দেহের পশুটাকে মাপে, রোমের লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত, না গ্লাডিয়াটারের স্পার্টাকাস অথবা অথবা নিছক পশু? মাতালের অশ্লীল শিষ্ স্মরণ করিয়ে দেয় কালহীন সময়েরও অঙ্ক আছে, যা অর্ব্বুদ নিঃশেষিত অজানা এক রাশি।

হৃদয়ের ছোট্ট দেহটা নিয়ে সে একজন আদর করে, লোমহীন দেহটা সযত্ন পবিত্র; সেই ছোট্ট দেহ বুকের মধ্যে নিয়ে খিল খিল করে হাসে বোকার মত অভিমানে ঠোঁট বাঁকায়—হৃদভাগের মুঠোয় তুলে নিয়ে বলে এখানে হাত রাখ, ভয় কি—এখানে—এখানে—নীল রক্তের উচ্ছ্বাস—ঘর্ম্মলোল জিহ্বা দিয়ে জুড়িয়ে নেয়। যে পশু খাদ্যের সঙ্গে অসহযোগ করেছে তার বিশীর্ণ দেহটাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে এনেছিল, বুঝি জোর করে তাকে গলাধঃকরণ করান হল—মুখ ফেরান অনীহা স্থির হয়ে দেখলে অমার্জ্জনীয় আত্মসমর্পণে তার দেহটা কেঁচোর চেয়েও অকিঞ্চিৎকর। জ্ঞানের পরম নিবৃত্তি এমন নিরর্থকতায় সে কোনও দিনও জানে নি।

হৃদয় প্রশ্ন করে—কি করে বাঁচ?

—বাঁচি তোমাদের বুকে ধরে—।

পৃথিবীকে কিছু ভাল কী সে দিতে পারত? মনে হয় না তো কোনও দিন সে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সেই সব মেয়েদের কথায়, যারা যারা বলেছিল—জান আমার বুকের মধ্যে অনেক ঘুম

আর স্বপ্ন—যারা তাকে বিশ্বাস দিয়েছিল পৃথিবীতে তারো কাজ রয়েছে সূর্যের হৃৎপিণ্ড থেকে প্রচণ্ড আলোর রথকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে এই অনড় অন্ধ দিনগুলিকে সে অনেক দূরে চালিয়ে নিতে পারে, যেখানে অনন্তজোড়া ভোর বেলাকার স্বপ্ন।

শূন্যতা কিছু কী ওজন হীন—পণ্যা মেয়ের দেহে তার কিছু জেনেছিল সে। অনিবার ভ্রূণস্থ অন্ধকার ইচ্ছা থেকে সে নবজাত শিশুর মত কেঁদে উঠল, আর পথে তার উদ্দাম কৈশোর আকাশের নামহীন অসংখ্য তারার মত জেগে রইল অম্লান, যেন সিন্ধু নদীর কালহীন স্রোতে জন্ম জন্মান্তরের যৌবন পদ্মের মত ফুটে উঠেছে। জিরাফের মত আত্যন্তিক অস্তিত্বকে সে উর্দ্ধগ্রীবা হয়ে দেখলে। দেখলে শীতের সাদা চাদরে পৃথিবীর সব পরিচিত মুখ তার পাশে পাশেই হাঁটছে, যাদের মুখ সে দেখে দেখে সম্ভবতঃ ভালবেসেছে, কেননা, তারাও যন্ত্রণায় হাত মেলে আছে, তারই সঙ্গে পীড়িত কুকুরের মত ক্লান্তি নিয়ে রয়েছে সেই অসিত ধর, রাতুল গুপ্ত —এঁরাও, তাঁরাও আর আমি এবং হৃদয় ঘোষাল।

তাই বলি সে বুদ্ধিতে বৌদ্ধ আবেগে বৈষ্ণব। আমারই চেনা এক মেয়ের তমাল চুল দেখে রাধার মত সে ভাল বেসেছিল আর তথাগতের মত শান্ত হয়েছিল মন—তার অনুরাগের অচির দর্শনে।

খৃষ্টমাস

আলো হল—অনন্ত ক্লান্ত অন্ধকার এখন বিদায় নিচ্ছে। আস্তাবলের শুকনো ঘাসের গন্ধ বাতাসে। অনেকদিন আগেই তো ঘোড়াটার গা থেকে জিন নামানো হয়েছে, লোহার মুখ বন্ধটাই কেবল খোলা হয়নি। ভোরের আঁজলা রোদ ক্ষয়ে যাওয়া লোহাটার গায়ে ক্ষণে ক্ষণে আছড়ে পড়েছে। সে দিন খৃষ্টমাস।

ঘোড়াটা অকেজো হল—আর তারই মত বার্দ্ধক্য বুড়ো সহিসেরও। কবে যে তার উজ্জ্বল চোখ দুটো সন্ধ্যার মত স্তিমিত হয়েছে, সেখানে এখন আর আলোর সাড়া জাগেনা। ম্লান প্রায়ান্ধ বিগত গৌরবের স্তব্ধ কৌতুক এখনও যা কিছু আছে তা ঘুমের আগে স্বপ্ন স্মৃতি। চোখে ছানি পড়েছে।

সেই সব উৎসব দিনে যারা তাকে ভাড়া গুণে দিত—কলকাতার রৌদ্র চমকান অনির্ব্বাণ দুপুরের ব্যস্ত বেলায় যখন সে মামলার উকিলদের তোষাখানায় পৌঁছে দিয়েছে, সেই সব খোকা খুকু যারা নীল বেগুনি বেলুন উড়িয়ে বসেছিল তার পাশে শীতের হিমেল জড়োয়ায় তারার রাতের চাঁদোয়া মাথায়—অশ্বক্ষুরের আর পিতল আঁটা জিনের টাক টাক ছম ছম কলরবে মিলে আছে সে সবদিনের মর্ম্মভাগে তার জীবনের অনেকখানি কাল। যেন আড়ানা রাগিণীর অস্পষ্ট ছবি।

আজ সে সব ছবিতে কালি ঝুল পড়েছে। উৎসবে যারা ভীড় করে তাদের মুখ পাণ্ডুর। অস্থির আবর্তে ঘূর্ণির ঘোলাজল, এঁঠো শালপাতা ছেড়া কাগজের জড়তা ধুলোর চিৎকারে সব সাড়া, এই

নিয়ে সহর। আর অবিশ্বাসীরা ভুলে গেছে এমনি দিনে যীশুখৃষ্ট জন্ম নিয়েছিলেন।

সেদিন সহরে শীতের হাওয়া প্রখর হয়ে জাগছিল। আস্তাবলের সামনে বহুকালের বট গাছটা পাতা ঝরিয়ে দিতে শুরু করেছে। ওর অনেকদিনের সাথী ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। নালজোড়া অবোধ এক শ্রান্তি তার নিদ্রাহীন নির্ঘুম রাতের মতই অনন্ত মনে হয়েছে।

টমাসের বয়েস হয়েছিল ষাট। চীনে পল্লীর ইহুদীদের ভজনালয়ের পিছনে জীবনের চল্লিশটা বছর কাটিয়েছিল সে, এখনও আছে এক চীনা কারিগবেব কৃপায় এখানে এক কারখানার প্রান্তদেশে। টিনের ছাউনী আছে মাথার ওপর, ওটুকুই কেবল—দেওয়াল যা ছিল তাও ভাঙ্গা হয়েছে। হয়তো ওখানে অন্য কিছু হবে, মস্ত দশতলা বাড়ী বা চওড়া রাস্তা।

ঘোড়াটা ওখানেই বাঁধা থাকে। গাড়ীটা এই সেদিন পর্যন্ত ছিল—বিক্রী করতে হয়নি। ইটে রঙেব দুটো দাঁড়ি টানা ছিল গাড়ীটার গায়—অর্থাৎ সেকেণ্ড ক্লাশ, কাল চকচকে গদি, ভেহিকেল ডিপার্টের চাকতি লেখা ভাড়াব তালিকা—এই সব হ'ল তার গাড়ীর কথা। কিন্তু সে সব বস্তুর চেয়ে গাড়ীর পেছনে পাদানটার কথাই টমাসের বারে বার মনে পড়ে।

মনে পড়ে মিষ্টি বুনো ঘাসের গন্ধ জড়িয়ে থাকত সেখানে। লোহার জালতিটার উপর সব সময়েই তো কিছু ঘাস রাখা থাকত।

দশ বছরের যখন ছেলেবেলা টমাসের, ঘর ছেড়ে এই এক ঘোড়ার গাড়ীর পিছনে চড়েই সে চলে এসেছিল। চলে এসেছিল মিষ্টি বুনো ঘাসের গন্ধে মুখ গুজে চুপ করে। 'পিছে ছিপটি' 'পিছে ছিপটি'—

অন্য হিংসুক ছেলেরা চিৎকার করেছিল। না তার গায়ে সহিসের সেই অলক্ষ্য চাবুক এসে লাগেনি। সেই সহিসই তাকে ঘরে নিয়ে এল আদর করে; এতটুকু কাল থেকে বড় হল তারই ঘরে, পেল সহিস হবার অবাধ অধিকার।

টমাস আর ফিরল না। মা ছিলনা—থাকবার মধ্যে এক বুড়ী কাকী—শনের মত চুল যার, ডাইনীর মত চোখ, টমাসকে খুঁটিয়ে খতিয়ে তাড়িয়ে তবে কিছু খেতে দিত। না ফিরবে না সে সঙ্কল্প করেছিল, ভাল লেগেছিল সহিসের কাজ। গঙ্গার বুক জোড়া পুল ডিঙ্গিয়ে হাওড়ার আলো ঝলমল মস্ত ইষ্টিশন তাকে অবাক করেছিল, সেখেন থেকে ফিটন চলত ছম ছম টম টম শব্দ করে গঙ্গার বুক বাঁধান পুলের উপর দিয়ে, চলে যেত বড় বাজার, নূতন বাজার—তামাম ক'লকাতা।

শুনেছিল তার বাবা জাহাজের কাজে গিয়েছিল, সেও ফেরেনি। টমাসও তেমনি,—জীবনের বিশাল সমুদ্রে এসে সেও হারিয়ে গেল, ভুলে গেল ঘরে ফেরার কথা।

ঘর। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। তখন টমাসের সারা দেহে যৌবনের অপরিসীম উল্লাস, পেশী পেটান লোহার মত মসৃণ ভাঁজ করা, চুল কোঁকড়ান কাল, টিকল নাক ও থুত্‌নিতে আশ্চর্য পৌরুষের উচ্চকতা, চোখে যৌবনের দুরন্ত সন্ধান। তিরিশ বছর সে সহিসের ফরমান খেটেছে, ঘোড়াকে দানা খাওয়াতে দলাই মলাইয়ের কাজে কেটেছে সন্ধ্যে সকাল। দিনভর ভাড়া খেটে যা পেয়েছে সব তুলে দিয়েছে বুড়ো সহিসের হাতে। নিজের হাতে যা পেয়েছে দুটি চারটি আনা সবই বিড়ি পান তামাসায় ফুরিয়ে ফেলে দিত টমাস। কি হয় এ দুটো পয়সায়—কী হবে? ইয়ার মানুষ

জুটত যারা নিয়ে যেত তাকে টেনে হিন্দী ছবির জলসায়, সরাবের ফূর্ত্তিতে এমনকি জুয়ার নেশায়ও সে মেতেছে। প্রলোভনে পা পিছলে গেছে, দুর্দ্দম যৌবন পশুর মত অবুঝ হয়েছে দেহে।

বেবাক বুরবক্—মেতে আছে নেশায়, জুয়ায়—বেশ্যার বকরে টাকাগুলো ফুকে দিতে ?

'চ'ল্‌বে চল'—'এ যোয়ানী কি হাওয়া আ যা আ যা'—ইয়ার দোস্তদের দুর্নিবার সখ্যতা তাকে সেধেছে আর সেধেছে।

'নেহি—নেহি'—কোনও দিনও এসবে মাতোয়ালা হলে চলবে না। ও সবে মতি হলে মদ্দ মানুষ হবার কী হ'ত, কী হ'ত ঘর বাঁধবার ? নিজের গাড়ী চাই—নিজের গাড়ীর সহিস নিজে, ঘোড়া নিজের। এ সবের জন্য অর্থ চাই। দিনান্তের রুজি যক্ষের মত তাই আগলেছে। সরাব খায় নি, চীনে পাড়ার ডাইনী মেয়েগুলিকে এড়িয়ে চলেছে।

ঘর হবে নিজের—ঘরণী এক জন্ম হবে যে নারী, তার জীবনে সে একান্ত তারই। অদেখা সে নারীর জন্য বুক ভরা দরদে পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে সে—শান্ত দয়াময়তা তার চোখে আলো এনে দেয়। যে কাকীমা তার শিশুমনে ভয় জাগিয়েছিল, টমাসকে তাড়না করেছিল একদা, তার প্রতিও সে দয়াদ্র' হল। কাকীমা টমাসের খবর নিত, কেননা সেই অসহায় টমাস আজ মদ্দ মানুষ অর্থোপার্জ্জক।

টমাসকে বিবাহ দিয়ে সংসারে স্থিতভিত করেই যে খুড়ীমা শান্তিতে মরতে পারেন নইলে নয়—তাঁর একথা টমাস বহুবার শুনেছে। বুড়ী যখন বুকে হাত রেখে যিশুর কাঁটা স্মরণ করত আর বলত—প্রভু পাপীকে শাস্তি দেন, পাপীরা প্রভুকে স্মরণ করলেই

মুক্তি পায় ; টমাস মনে রেখ কাকীমাকে তোমার কিছু দেয় আছে, তখন কি সে আর ফেরাতে পেরেছে তাকে ? দিয়েছিল টমাস ওর স্বল্প আয়েব থেকে কিছু, বছবের কটা দিন খৃষ্টমাসে কি খুশীই হ'ত সে, নিজের জনকে পোষাক দিতে পেরেছিল বলে, কিছু শুয়োরের মাংস চীনে কপি আর কমলার উপহার।

এমনি কটা খৃষ্টমাস—শীতের দুপুর আলো করে আলোর নুপুর বেজেছে। রাতের কুয়াশায় অপলক নক্ষত্রের করুণা নেমে এসেছে অন্ধ পৃথিবীতে।

গীর্জ্জায় গিয়েছিল সেও। ঝিব ঝিরে দেওদার পাতার এক প্রলম্বিত ডালের ফাঁক দিয়ে গীর্জ্জার চূড়ায় বাঁধা দোলান ঘণ্টার ঢং ঢং সাড়া জাগত। কিন্তু কী করুণ আর মিথ্যা হ'ল সে ঘণ্টা ধ্বনি। কেউ জানল না যিশু হলেন সকলেব, শুনলনা যে সবার সে আপন। সাদা চামড়া মেয়েদের ভীড়ে টমাসের কাল কাফ্রীর মত চেহারাটা তাই উপহাসিত হ'ল। চাঁদনীর ট্রাউসার কালবাজারের কাল কোটে আঁটোসাটো খাটো বেমানান মানুষটা পোষাকী বিলাসী মেয়েদের উলঙ্গ দৃষ্টির উপেক্ষায় কুঁকড়ে গেছে। জাতিতে খৃষ্টান হলেও সে পেশায় সহিস। ওরা ভদ্র বিত্তবান। সে গরীব ছোটলোক আর বেজন্মা কিনা কে জানে! মাকে তার মনেই পড়েনা, বাবার কথা শুনেছে যে জাহাজের চাকুরীতে গিয়ে সে আর ফেরেনি।

না আর কোনও দিন সে গীর্জ্জায় যায় নি। সড়কে সে খৃষ্টমাসের সোয়ারী নিয়ে ফিরেছে। খোকা খুকুরা বেলুন উড়িয়ে বসেছে তার পাশে, গোরা সৈন্যরা মহব্বতের গান গেয়েছে সাদা ছুকরীদের গলা জড়িয়ে, বৃদ্ধ পিতামহ পিতামহি নাতিদের সঙ্গে পিশীদের বাড়ীতে ভোজ খেতে গেছে। আরমানী ষ্ট্রীট, ফীয়ার্স লেনের সাহেব বিবিদের

টমাসের ফিটন না হ'লে চলতই না। কত সোয়ারী—কত কত মুখ আর পরিচয়। দিন ফিরছিল, পুরান জমানা পুরাতন হল। পীত স্মৃতির ক'টা পর্দ্দা যেন কলকাতার সব রাস্তা ঘাট। যুদ্ধের ত্রস্ত ভীত দিনের ব্যস্ত পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল একদিন, অন্যদিনে দাঙ্গার দুঃশীল খুনের ক্ষতে নিদারুণ নির্লজ্জ হয়েছিল সড়ক্ আর শেষে আজাদী হাসিলের ঝ'ড়ো হাওয়ায় দিন বদলাল।

কবে সে সেই ছোট্ট বেলায় ফিটনের পাদানে বসে মস্ত পৃথিবীতে বেড়িয়ে এসেছিল সে সবদিন আজ অতীত কাহিনী। এখন টমাস হয় ফিটনের একজন মালিক। বুড়ো মনিব গাড়ীটা বেচে দিয়েছিল টমাসকে স্বল্প মূল্যে,—ঘোড়াটাও। ঘোড়াটার পিঠ চাপড়ে টমাস বলত—বেইমানী করনা, ভুলে যেওনা। আমিই তোমার মালিক।

ঘোড়াটা পা ঠুকে ঠুকে শব্দ করে উঠত—চিঁ হি-চিঁ হি। অর্থাৎ টমাসের হাতেই তার জন্ম মৃত্যু বাঁধা পড়েছে একথা পশু হলেও তার প্রত্যয়ে আছে যেন। টমাস এখন থমা নয়, অন্য সহিসেরা থমাস্ বলে তাকে আদাব জানায়।

প্রতিটি সূর্যোদয়ে নূতন হয়ে ওঠে পৃথিবী, উদ্দাম আলো নেমে আসে আকাশ থেকে, রৌদ্র ঝরা হাওয়া লাগা আশার কাঁপনে দিন শেষ হয়। ঘাম আর ক্লান্তি শেষে শ্রান্তি হরা তারার রাত্রি যৌবনের কাজল এঁকে দেয় চোখে।

ছম ছম করে ওঠে ঘোড়ার পিঠে পিতল বকলস, বাজে টম টম ঘণ্টা। টগবগিয়ে শান বাঁধান সহরের রাস্তা গড়িয়ে যায় অশ্ব খুরে।

এমত একদিন। ইহুদিদের ভজনালয়ে একটি মেয়ের চোখের তারায় কী দেখেছিল টমাস্? অসহায় একটি মুখ তীক্ষ্ণ নাসিকায়

কুঞ্চিত এক উপেক্ষা তবু, দীপ্ত তুটি চোখে জেগে আছে নীলাম্ভ কৌতুক ব্রীড়ায়, বুকের খুন টেনে নিলে তা টমাসের। অদূরে মাংসের দোকানের বুনো হাঁসের পালক ছাড়ান দেহটার মতই রক্তাক্ত আর মৃত মনে হ'ল নিজেকে। সেমিজের বাইরে পাতলা লম্বা হাতটা সাপের মত এলিয়ে ছিল বুকে, ঝিকমিক করে হাসছে সে মেয়ে, হাতের মোটা রবারের নীল বালায় আলো ঠিকরে উঠেছে, হাতখানি দিয়ে যখন সে ডেকেছিল টমাসকে।

বুকটা যেন তার শত নাগ দংশনে জ্বলে উঠেছে। উচ্চকিত হল হৃদয়। ভিক্ষা চাইছিল মেয়েটি, কিন্তু ভিক্ষা কেন? তোমাকে ঘরে নিয়ে যেতে পারি এগিয়ে এল টমাস হাত ধরল তার,—ঘরণীর অধিকার দিতে পারি তোমাকে—যাবে আমার ঘরে?

টমাসের কথা শুনে বিনম্র দ্বিধা জড়িত কণ্ঠস্বরে কৃতজ্ঞতা উছলে উঠল তার, বললে—আমার দেমাক তো ঠিক নেই।

তবে?

—আমার মাথা খারাপ বলে ওরা আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে।

—তাই হবে তোমার শিরে বিষ আছে নইলে সোমত্থ মেয়ে তুমি পথে নেমেছ যে, কোনও পুরুষকে ছুবলে দিতে?

চোখে দ্বেষ জ্বলে উঠল নাগিনীর, বললে—বেইমান, পুরুষরা সব বেইমান, ওদের কেটে দিলেও আমার জ্বালা জুড়োত না যে।

এবার টমাসের পৌরুষ হেসে উঠল—তোমার ছোবলে কত বিষ? আমার কাছে যে ওঝার মার রয়েছে।

খবরদার! আমার নাম সারা, তুমি হচ্ছ একটা ছুঁচো বদমাস—মেয়েটি চিৎকার করে উঠেছে। টমাস গলা নামিয়ে বলেছে—তবু

—তোমাকে আমার চাই। হাত ধরে বলেছে—চল, চলা আও মেরা ডেরা।

চলে এল সারা, টমাসের ঘরণী হয়েই এল। চীনে মেয়েরা সারাকে ছোট ছোট চোখ মেলে পিট পিট করে দেখে, ঈর্ষাতুর হয় তারা। আঁস্তাকুড় থেকে রাণীর পাটে বসেছে সে—নীল ঘাঘরা সাদা কামিজে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে সবার। ওর গৃহস্তিকে তাকিয়ে দেখার মত। দিবা রাত্র সারাকে ব্যস্ত দেখবে। ঘোড়ার জন্য দানা মাপা, ঝাড়া ঘাস তুলে রাখা। ফিটনের বাতি থেকে কালি ঝুল মুছে চকচকে করে তোলে সে,—তেল ভরে। রুটি সেঁকে, ভাজি ভাজে। ঘর গুছিয়ে ধূপ জ্বেলে দেয়।

সারার মত মেয়ে হওয়া কী সোজা কথা—আর তার মত গৃহিণী পাওয়া? কী এনে দেবে সারাকে, টমাস, কিসে খুসী হবে সারা? উতলা ভাবনায় এখন এক অভাবনীয় বোধ টমাসের দেহে মনে। চীনে গলিটা স্বর্গরাজ্য বলে বোধ হল। যারা চুরি করে, চোরা মালের চালান দেয়, সরাব চোলাই করে, বেবুশ্যের বিল্লী হয়ে থাকে, বেমক্কা দাঙ্গা করে ফেলে—সেইসব প্রতিবেশীদেরও সুন্দর মনে হয়। কারও প্রতি কোনও অভিযোগ নেই টমাসের, যিশুর কৃপা টমাসের জীবনে এতখানি যখন, তখন সে মানুষকে ঘৃণা করবে কেন? পাপকে সে ঘৃণা করে, পাপীকে সে ঘৃণা করবে কি তাই বলে! রূপ ও বিরূপের বিচারে পৃথিবীটা আর কত খান খান হবে?

কিন্তু বিচারের ভার ত টমাসের হাতে ছিল না। সারাই প্রমাণ করে দিলে। দীর্ঘ দিনের সাহচর্য্যও একদিন অমম হতে পারল প্রেমে—কোথায় চলে গেল সারা, কোন নিরুদ্দেশে কেউ বলতে পারল না। বাতুল ছিল সে—নাগিনী? না কী সে ছিল কোনও

নীল আকাশের পরী! বিচ্ছেদের বিষে নীল হয়ে উঠল টমাস, পৃথিবীটাও। হারামী-কেউ ভাল নয়—চক্ষু রক্ত হল। মাথার রক্ত একবার যেন বুক থেকে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল।

বাতাসে ফিস ফিস করে কিসের মন্ত্রণা শোনা যায়—হে উদ্দাম বন্যতা একবার জেগে ওঠ! আদিম আততিতে সমস্ত চীনে পাড়াটা যেন উল্কি পরেছে। চীনে দোকানের ঝলসান স্থয়োরের মাংস, গরম ভাতের ধোঁয়া, মদের ফেনা, ধূপ আর প্রস্রাবের গন্ধে উৎকট আড়ি ভাব, বেশ্যার বিড়ম্বিত বিহার, জুয়ার আড্ডার মৃত্যু রহস্যালোক—পৃথিবীর গর্ভদেশ জুড়ে আছে।

—ভয় নেই এখানে এস। অঙ্গীকার হীন ক্ষুধার বিভৎস কান্না অস্বীকারের এক উৎকট রব শোনা যায়—হে আদিম ভয়হীন জাগো!

টমাস সমস্ত বিত্ত খুইয়েছে—জুয়ায়, মদে। খুনও তো হয়ে যেত সেদিন এক বেশ্যার ঝামেলায়। তবু ভয় নেই। ডাকাতের চেয়েও ডাকাত বনে যাবে সে। খুন—সেও খুন করবে! গাড়ীটা বিকিয়েছিল, ঘোড়াটাই কেবল ছিল, তাকেই কি সে সবার আগে খুন করবে? জিরজিরে শীর্ণ ঘোড়াটার দিকে চেয়ে তবু বলতে হয়—আহা থাক আর একটা খৃষ্টমাস।

খৃষ্টমাসের আলো ঈশ্বরের করুণার মত! এই আলোর আকাশের নিচে বিচার চলেছে। কয়েকদিন ধরেই চেষ্টা চলেছিল টমাসকে বাড়ীটা থেকে তাড়িয়ে দেবার। যখন তার সঞ্চিত অর্থ কিছু ছিল তখন পর্যন্ত চীনে দালালটা তাকে তারিফ করেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে মদের আড্ডায়, সেটুকুই যা চীনে লোকটার লাভ। টমাস সর্ব্বস্ব হারাল। তবু পুরান জমানার সম্মান তার খোয়া যায় নি। সে দিন ঘোড়াটাকে টেনে বার করেছিল সেই চীনে লোকটাই।

—কেন ?

—ঘর ছেড়ে দাও, এখানে জুতোর কারখানা বসবে। বেকার ঘোড়াটাকে পুষে কি লাভ ?

—তোর কিরে বেইমান কা বাচ্চা—খুন করব, খুন করব—টমাস গর্জ্জে উঠল, বুকের পাজরগুলিতে ঢেউ খেলে গেল আহত রোষে। লোক জমেছিল ভীড় করে। কেউ বললে—ঘরটার মালিক তো চীনেটা নয়, তবে ?

—বেটা আমার পয়সায় রোজ মদ খাবে, আর ঘোড়াটা উপোষে থাকবে—এই মতলব।

কা'রা পচা কমলা লেবু ঢেলে দিয়েছিল ড্রেনের পাশে, ঘোড়াটা এসে সেখানে পচা কমলা লেবুর ড াঁইতে মুখ গুজে দিয়েছে। দিন শেষের সূর্যালোকে জীর্ণ ঘোড়াটার দীর্ঘায়িত দেহের ছায়া পড়েছে। সেখানেই টমাস বসেছিল। কুয়াশা স্থির নীল আলোয় শীতার্ত সন্ধ্যা কুটি কুটি হয়ে ছড়িয়ে গেল। টমাসের সেই আশ্চর্য কৈশোরের স্মৃতি ধূলিলান হয়ে গেছে, আশ্রয়হীন অসহায় প্রৌঢ়ত্বের পীড়নে আগের পৌরুষ নেই। কলকাতার ক'টা সড়কের স্মৃতি করুণ ধূলোট মিনতিতে তবু কেন পা জড়িয়ে থাকে!

চীনে পাড়ায় আবার ভীড় জমে। অজাত এক শিশুর জন্মদায় নিয়ে একটি পাহাড়ী মেয়ে পথে নেমে এসেছে, তাকে নিয়েই জটলা। অজাত এক শিশুর জন্মদায় কেউ নেবে না, সে শিশুতো কামনার ভ্রূণ নয়, সে এসেছে দারিদ্র্যের মূল্যে। বিকার যেখানে ঈশ্বরের বিচারকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে সেখানে জাগতিক এক কিম্ভুত মূল্যের সঙ্গে অজাত শিশু ও মাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য বিনিময় ঘটে গেছে। বোধ

নেই। ব্যথা আছে,—অসহ্য উদর যন্ত্রণা, গর্ভ পীড়নের কান্না। সে কান্নায় পৌর ব্যবস্থা বধির হয়ে যায়। উপহাসিত হয় সমস্ত করুণা।

টমাস বুঝি এই শূকরীর আত্মবিলাপে সান্ত্বনা দেবে—আরে ছোঃ, তাতে কি হবে? শূয়োর—তামাম দুনিয়া শূয়োরের মত বোধ বিবর্জ্জিত, আত্মতৃপ্ত কুৎসিত জানোয়ারের মত ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ওয়াক্ থু, থু, নিজেও কি তাই,—মায় ভি হারামী বন যাই, মায় ভি, —ভেবেছে টমাস।

রাত্রি—অনামা এক শরাহত পশুর মত অন্ধকার যন্ত্রণায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, বোবা ব্যাথায় ফুঁসিয়ে উঠে পৃথিবী। দারিদ্র্যে নিরঙ্কুশ প্রহার নির্ম্মম হয়েছে, লোভের বিষাক্ত গরলে জর্জ্জর হয়েছে দেহ। অনেক অনাচার গা পেতে নিয়েছে টমাস। এবার সে ঘর ছেড়ে পথে নেমে আসবে। মানুষের জন্য মানুষের করুণা নেই। তাকেও গৃহ ছাড়া হতে হবে। শয়তানের কুৎসিত ভীষণ হাতটা তার দিকে এগিয়ে এসেছে।

গীর্জ্জায় রাত্রির উপাসনা শেষ হয়েছিল। টমাস—যে অবিশ্বাসী, যে পাপী, যে শয়তানের দাবীকে পথ ছেড়ে দিলে, অবাক পৃথিবীর আশ্চর্য্যময়তা তার চোখে আর আলো জ্বালবে না। সে ঈশ্বরের বিচার চাইবে না।

বিদ্রোহের হাওয়া বইছে। কনকনে শীতে তারা দাঁতে ধার দিচ্ছে। খুন করবে টমাস, খুন! জিরজিরে ঘোড়াটাকে সে দানা দিতে পারেনি। অন্ধকারে পায়ের শব্দ করে সে প্রতীক্ষা করছে। রাত্রি আর মৃত্যু সহোদরার মত পিঠে পিঠ দিয়ে রয়েছে।

' টমাস ছুরিটা হাতে নিলে, অন্ধকারেই ধার পরীক্ষা করলে

ছুরিটার। হাত কাঁপে না—না! বাইরে আকাশে টল টল অশ্রু-জলের মত অসংখ্য তারার মিনতি, বিলিতি বাজনার রেশ, রিক্সার টুং টাং ধ্বনি।

দূর বাতাসে কিসের মর্ম্মর শোনা যায়,—ফিটনের পাদানে বসে ছোট্ট টমাস প্রকাণ্ড পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছিল একদিন। ছোট্ট টমাসকে আলোকঝরা দিন দুর্দ্দম আবেগে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছিল অজানা জীবনে—রাতের লাখো তারার রোদ্দুর যার চোখে চিত্রিত করেছিল অজস্র ছবি, আজ সেখানে অন্ধ নেমে এসেছে। জানালা বন্ধ করে দিয়েছে টমাস।

এখনি অন্ধকারে রক্তের ধারা নেমে আসবে, অবুঝ অবিশ্বাসী এক মৃত্যুতে লেখা হবে ভারবাহী জীবনের শেষ বিচার।

তবু বিস্মৃত কালের মর্ম্মভাগে শিশু টমাসের কান্না শ্রুত হয়। —কে কাঁদে? চমকে উঠল টমাস—নবজাত শিশুরই কান্না শোনা গেল। আলো জ্বালালো টমাস, তৈলহীন বাতিটায় নিষ্প্রভ আলো চমকাল। আস্তাবলের এক কোণে শুকনো ঘাসের উপর একটি নবজাত শিশু কঁকিয়ে উঠেছে, আর তারই পাশে সেই পাহাড়ী মেয়েটা প্রসবান্তে অন্ধকারে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে।

কখন যে মেয়েটি টমাসের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল টমাসতো তা জানে নি। অপরূপ এক আলো মেয়েটির চোখে।

যে চোখে কিছু আগে মৃত্যুর অন্ধ মেতে উঠেছিল, নির্ম্মম নির্ব্বিচার অবিশ্বাসী জিঘাংসায় রাত্রি কালহীন প্রত্যয়ে আদিম হয়ে উঠেছিল, সে চোখেও মমতার উৎস উজ্জ্বল হল, নবজীবনের ফল্গু স্রোতায়িত হল। পাহাড়ী মেয়েটির চোখে কৃতজ্ঞতা উছলে উঠেছে। এখানে

ওখানে কিছু রক্তের স্বাক্ষর ছিল, কিন্তু সে রক্তে মৃত্যুর পীড়া নেই আছে নবজীবন দানের গরিমা।

প্রভাতের শিশির টুপ টাপ করে ঝরছে—ক্লান্ত অন্ধ শেষে আলো জাগছে। আজ খৃষ্টমাস। টমাস শুনতে পেলে নব জনমের আর্তি—দেখলে খৃষ্টমাসের আলোয় যিশু শিশুদের কান্নায় মিলিয়ে আছে।

রিক্সা

তার মুখ মলিন অথচ গম্ভীর ক্লান্ত দীপ্ত, শ্মশ্রু মণ্ডিত রামকৃষ্ণের মত দয়াময়তা সে মুখে। সে একজন রিক্সাওলা। রিক্সা টানে। নেই, পৃথিবীতে কেউ তার নেই। তার মুখ মনে পড়ছে।

রিক্সাওলা তোমার কে আছে ?

অনেকদূর অবধি যে কুকুরটি তার পায়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল তাকে দেখিয়ে দিলে—কেউ নেই, তবে এরা আছে।

আমার বন্ধুটির জন্যে অপেক্ষা করছি, সুন্নোত নাসা, অস্থির অস্থির দৃষ্টি নিয়ে তার চোখ, নাক আর রাশি রাশি ভাঙা চোরা ভাবনার ছবি যার বুক—আমার সেই বন্ধুটি রাস্তার এক মিছিলে মিশে গিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল হয়তো, হয়তো বিকেলের আকাশে অনেক রক্তাক্ত স্বপ্নহত দাবীর এক ধ্বনির সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর মিলে গেল। হয়তো সেইসব ভয়ঙ্কর ত্যাগী মানুষেরা তাকে পুনর্ব্বার প্ররোচিত করেছে—যেমন সে জীবনে বহু মিছিলের মুখে বিবুধ ছবি দেখেছিল তেমনি সঙ্কল্প তার।

তখনও নিঅন জ্বলেনি, তখনও মেট্রোর রঙ্গমঞ্চে পাংশুটে দিনের মলিন নাছোড়। ক্যাথিড্রালের ঘড়ির শব্দ পথের বেচাকেনার উচ্চরোলে ঠোঁট মিলিয়ে গেল। চড়ুই পাখীর ভীরুতার উপোষী কাল নির্জ্জন অলিন্দে গবাক্ষে জীর্ণ পাখা ঝরিয়ে দিয়েছে। এম অরগ্যানের পোষাক পরা কাঠের মানুষের চোখের মত তবু জীবনের জঙ্গম, কাফে ব্রাসারির চা কফির অনুগ অভ্যাসে, আলাপ কোন্দল

নিরাশার আবর্তের এক ভাবনা যা রিফুকর্ম্মের অতীত শত ছিন্ন আশার মত দূর ভাষণ।

টেবিলে গোল হয়ে আছে ভাবনার কয়েকটি কীলক। পেরেক—আতঙ্কের কিছু নিয়ে আমরা পরস্পর মুখোমুখি বসে কেউ কারো মুখ আর দেখিনা।

এটা একটা টেবিল। এক দুই তিন চার পাঁচ ক্রমিক আঠারোটি পেরেক। কাঁচের বাইরে দুটো জীর্ণ ঘোড়ার জিন দেখা গিয়েছিল। তাদেরই ইস্পাত মুখনালে শেষ সূর্যের আলোর মত ঈশ্বর অনকুভূত। সকল মানুষ সেইরূপ ভাল আছে কিনা সে জানেনা, সেই প্রমেয় ভাল লাগার তুলনায় ঈশ্বর অনকুভূত উপকথার অস্তিত্বের মত ইদানিং ক্ষণ ভালমন্দের অতীত এক জরায়ুর জল।

এক জরাতিকালের মিশ কাল চুলের বিভঙ্গে তার বাঁকা স্রোত সিঁথি—এক বিশ্বাস। এখানে এক গলি। তিন রাস্তায় মিশেছে। মতি শীল নিয়ে মানুষ আর দোকান ফুলুরি পাকের পোড়া তেল ঝাঁঝ মিশিয়ে রাখে। সিগারেট পান তবকের ওদিকে আরও ওদিকে কসা মাংসের রঙ আর পর্দ্দার ইয়ার সঙ্গীদের টিকিট কেনার গর্‌রা। পানওলা গোবাহাবা সেই যে ছেলেটি তাকে বোকা ভেবেছিল কিনা, কে জানে। সে পান তবকে জর্দ্দা মাপে। পৃথিবীটা শুধুই ঘোরালো গড়ানো টাকার মত টঙ্কার দিয়ে থামা—ভাবে।

নামা যায়না আরো নিচে? সেই নিচু তলার সড়কে হাঁটছিলাম আমি আর আমার ঘ্রাণবৃদ্ধ বন্ধুটি। পানের দোকানে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল যাকে সহজেই চিনতে পেরেছিল আমার বন্ধুটি।—দেখ ও আমাদের দেখেছে। ওকে জান?

—জানি। হাঃ হাঃ—হেসে উঠলাম আমরা।

মাথা খারাপ নাকি—বেচাল? পানের দোকানের আপাত অবুঝ ছেলেটাও কি নিশ্চিত জানে; তাই তাকে কয়েক পয়সার চুরুট বিকিয়ে, সেই তাম্বুরিন ছন্দের মেয়েটাকে পয়সা গুণে দিয়েছিল সে সিগারেট কেনার ফেরত পয়সা, আর ভেবেছিল।

আর দেখেছিল সাদা দাঁত সে মেয়ের স্তনে নবনীত জমা দুধের মত, চিবোনো আঠা'র ইষৎ বিস্ফার। তাকিয়ে আছে গলান বালির বাষ্পের—নীল নিঃশব্দের মত। নিচু তলার আকাশ—সেখানকার মেয়ে। যেখানে আলোর তৃষ্ণা রক্তের হ্রেষায় হাসছিল সে—চোখে তার শতশতাব্দীর ঘুম রনিত রাত্রি। বেদুইন রাত্রির পায়ে বালি ঝরল—বিন্দু বিন্দু সীতার অবাক উল্লাসে বহুদূর নক্ষত্রের আলোয় মরুসিকতায় তার দেহ বাসনার বিবসনায় বিলোল।

—কে দেবে আমাদের চিরকালের ক্ষণিক আলো, এই জাগরণে অবিরত বাস্তবতায় স্থূল জরিষ্ণু কালের ঠোঁট পাংশু। পশ্বাচারী পাশব প্রহারে তার তনুমন জর্জ্জর, এমনি সভ্যতার অজ্ঞাত স্বপ্নে যারা নিরাশ্বাসেও বিশ্বাস স্থাপনা করেছে যে দুঃশাসনের রক্তমোচনে পৃথিবীর কবরী বাঁধা হবে তারই অঙ্গহীন ললিত আশার আলোকের আশ্বাস—কে দেবে তা আমাদের।

অন্যত্র ঘৃণার স্বর্গ। শ্রীল ত্বকাশ্রিত স্নেহ, দয়াময়তা, সুন্দর জীবনের এক মিথ্যা উপাখ্যান।

সেই মেয়েটি আমাদের মদ ঢেলে দিলে এক মুঠো যন্ত্রণার মদ। আমার কবি বন্ধুটি আবৃত্তি করলে—কোনও কবিতার অনুবাদ—

দেবমাতা—আমাদের দেবী
হৃদয় আমাদের এক অনিয়ামক প্রভু

আমাদের পাপ ক্ষমাকর—
আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করি—
যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে।

তখন বন্ধুটিকে বলেছি—আমার জন্মকালের রহস্য সে আমার ভোরবেলাকার স্বপ্ন, পবিত্র তীর্থের জল—তাকে পাবো, পাবো মায়ের ক্ষমা আমি আর মুখ ফেরাব না। তারই করলেখায় আমার অস্তিত্ব, বসন্তের দুরন্ত স্বপ্নে নিষ্ঠুর। রাত্রি থেকে দিনে, দুঃখ আর আনন্দে অতীত আমার তরুলতা বৃষ্টি রৌদ্রে তারই হাতের রূপময় তন্ময়তায় ফুল ফোটায়, তার মুখের অবাঙ মানসে চিন্ময় দূর আকাশের নক্ষত্রের স্থির ইসারা,—আমার কোটীকল্প মৃত্যুর নৈবদ্য তাকে দেবো। জান'না নাব্য ক্ষুধায় একদিন ছিল দুপুর জ্বল জ্বল, পিছল রাত্রির ধান সারি দেশান্তরের হাওয়া নিয়ে এসেছে, ছায়া ছায়া শস্যের মিত্রতা। যেমন মিত্র হয় আগুন, বরুণ প্রাণ, মৃত্তিকা দেহ, বৃক্ষ ইচ্ছা, পুষ্প প্রেম, ফল চরিত্র, পাথর স্থবিরতা, অন্ধকার—অন্ধকার যুদ্ধ ক্লান্তি, তমঃ হিংসা,—রিপু—নক্ষত্রের ক্ষমা, পাথর স্থবিরতা, পাথর স্বপ্ন শ্রী সূর্যের স্বাক্ষর। তার দেখা পাওয়া যার মুখ হঠাৎ দূর থেকে দেখা স্বপ্নের আবছা আবছা কাছে যে নেই—কাছে যে ছিল হঠাৎ কোথায় গেল তাকে খুঁজলাম, তার গান দূর থেকে ভেসে এল—দুঃখী বাতাসে শীতরাত ভরে শুকনো ক্ষেতে হেঁটে ফিরল যে তাকে বসন্তে ফুলের মুখ নিয়ে হাসতে দেখা আঁকা, তার ছবি আঁকব। আমি তাকে পাব বলে সে আমাকে চিরকালের যাযাবর করেছে।

অন্যত্র আর আমার দেশ নেই, কাল নেই, ঘর নেই, আমার স্থিতি নেই, অস্থিত। আমি না থাকলে কিছুই নেই। তবু ওরা আমাকে ডাকে!

এক মুঠো আলোর মুখ—এই প্রেতপারা অনুগামিতা থেকে—আমাকে বলেছিল—বাইরে চল, জলের ঢেউ—নদীর সফলতা শরীরে নিয়ে—সময় ভুলে যাও, এই কালের বাইরে এক চিরকালের রাঙা মাটির পথ আছে যেখানে আছে মনোরম বৃক্ষ—ক্লান্তির ছায়া।

বলেছে, বিশ্বাস করতে যা হয় না তা হবে—যেমন একটা ছবিতে প্রচুর আলো নীল হয়ে কেঁপে ওঠে কিংবা আকাশের দীঘল মেঘের আঁকা বাঁকা শেষ সীমায় গাঢ় রক্তের সূর্য্য শেষ হয়ে গেলে যেমন হয় জলে গঙ্গার গেরুয়ায় রাধার অশান্ত চোখের চিকন উদ্ভাসে যেন সন্ধ্যা অধরা কৃষ্ণের মোহন যাত্রার পথ বলে দেয়—আবার ভুল হয়, অপেক্ষা করি, বুঝি, মানি, অথচ কিছুতে বুঝতে চাইনা—জানি তুমি একটি ছবির নও, জানি আমি একটি অস্তিত্বের নই—ক'টা ভাঙা কাঁচের সময়ের মুখের—অজস্র প্রাচীন রক্তের কনিকায় আমাদের মনোলীন অস্তিত্ব। যদি তুমি একটি গাছের লতানো কোনও ইচ্ছা বলে ভুল কর সমাজকে?—ভুল করি যেমন আমি, যখন আমি ট্রামের মানুষের ভীড়ে হচ্ছি ভদ্রলোক, আপিসে দশটায়—অতঃপর আপিসের সে—আমি, রাস্তার ভীড়ে পথে নাগরিক, প্ল্যানিং কমিশনের সুক্ষ্ম আঙ্কিক যদি কবি হয়—সামাজিক সে আবার একা প্রভুত একলার, এই আমি! মূল বৃক্ষ—সেই গাছটি থেকেই ইচ্ছা—চরম, পরম, বীত, প্রীত, প্রতিহত, অনন্ত ইচ্ছার লতাটি আমি আর এক দ্বৈতে মেলা যেমন শুকনো ডাঙার মরা ঘাস জ্বেলে আমরা শীতের কড়িকে বুঝে নি,—তোমার সুন্দর যৌবনের অদম্য বিকর্ষকে মুক্ত করে দেই অন্ধকারকে বোবা করে দেই আমার বুকের নির্জন অলিন্দে—সে এক অনন্ত জলধারা, সে এক উষর বালিতে এক মরশুমীর হঠাৎ বৃষ্টিতে ফুটে ওঠা রাশি রাশি ফুল।

সময়ের কোন বৃত্তে আমরা রয়েছি? কেবল তারা বলত, বিশেষ

করে সে যখন বলে—আমার মনে পড়ল, অন্ধকারের ফেনাতে কয়েক টুকরো জ্যোৎস্না পিছলে যাবার মত, কটা অক্ষরে লিখেছিল—এখন এই সব কালে তোমাকে কেবল নিরত রক্তহীন মনে হয়। কারণ তুমি কিছুই হচ্ছনা, কারণ তুমি এক গ্লাস শূন্যতার একটা তৃষ্ণা, কারণ তুমি প্রেমিক যদি না হতে পারলে তবে যে কোনও কালের ভূপ্রোথিত বৃক্ষের মত অঙ্গার হবে না, কেননা একদিন বরফের বয়সী কাঁচে সেই আগুনের আঙ্গুল খেলা করবে না আর-না।

শান্ত স্থির সেই মেয়ের চোখ অবুঝ হাসিতে আয়ত হল।

—যন্ত্রনার মদ ঢেলে দাও মদ আরও ; মরুতাচারী আলো নিভে যাক ; চিৎকার করে উঠল বন্ধু।—মানিনা এই মানবক প্রতীতি—দেখ সর্বত্র রক্ত পুঁয ক্ষত তুষ্টির এইসব সংবিধান, তোমাদের রাষ্ট্রের যত রটনা সব স্ফাতোদর লোল অহঙ্কার,—ক্ষুধার শত অপমরণে ডাই-নোসারের অতিকায় কঙ্কালের চিৎকারে ভরে গেছে পৃথিবী।

—ঘৃণা—প্রাগৈতিহাসিক সমস্যাকুল সমাজের নীতিকে এই তিমির ধর্ম্মান্ধতাকে ঘৃণা করেছি।

—মুক্তি চাই, নিরীশ্বর জড়তা থেকে, ঈশ্বরের অতি দোহাই, দয়া, স্নেহ প্রীতির, দেবানুভূতির সেই শীলাখণ্ডের অকাট সদাচার থেকে মুক্তি চাই।

তাই সে বলেছিল,—সদাচারী সেই বন্ধুটি—ধোঁয়া, ফ্লোরেসেণ্ট আলো সিগারের ধূমানীল ব্যূহে তার আত্মপ্রশস্তি একটুও খণ্ডিত নয়, অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যদিও চাকরি করে সে, সরকারের সেই কাজ লক্ষ-মানুষের সেবা অপেক্ষা পীড়নকেই উৎকট করেছে, তবু তার ধারণা সে সদাচারী। বলেছিল সেই সূন্নোতনাসা প্রীতদৃষ্টির যুবকটি,—আমি যদি মুক্তি চাই সে এই শূকরের উদর তৃপ্তির মেদস্ফূর্ত্ত মানুষের ভোগ-

বাসনার ভূগোলে রত হয়ে নয়। আমি চাই বেদনার নীলাকাশে নীল হয়ে ফুরিয়ে যেতে, এই অর্থহীন বিরামলেশ মৃত্যুর পায়ে জীবনের কাঙাল হয়ে নয়—মৃত্যুর সুন্দর আসঙ্গে এই জীবনের ক্রান্তিক্রতাগমে মৃত্যুকে পেতে চাই পোষা কুকুরের বকলসে। যে প্রভুভক্তটি আমাকে অনুসরণ করবে সর্ব্বত্র, স্বর্গের স্মরণামৃতে, নরকের নিয়ত অনুতাপে। তাছাড়া কি আছে? তোমার আছে শুধু কর্ম্ম! এই ঝকঝকে ঈশ্বরের হাতের প্রসারে যে আকাশ আলো অমৃত রয়েছে—অথবা কোনও দিন ছিল কিছুর অধীতাভিলাষ মাত্র যা আজ আর নেই—তাই দেখিনা, দেখব না, কোনও দিন না। বলতো কিছু কি আর ভাল আছে?

—বলেছি কি কাজ তোমার, ভাল মন্দের বিচারে, এই ব্যূহ লীন বিষয় বিষয়ীর দূরশ্চক্রে অন্তহীন একাকীত্ব। মারণযজ্ঞের মন্ত্রযাপনের মত এই বিচার। অবোধ গরুর নিরীহতার মত ভাল, আর ভাল'র বিচারে।

কিছুতেই ভাল লাগান যায় না। যা পেয়েছে তায় তৃপ্তি নেই—অন্নে সুখ নেই, মৃত্যুতে লক্ষ মৃত্যুর সহস্র জরার জীর্ণ এই জীবনের সহিষ্ণুতা ভাল লাগে না। এই সভ্যতা পা দিয়ে দলে যাই, পা দিয়ে চলে চলে রক্তের যুগার্জ্জিত পাপকে মুক্ত করে দিতে যাই। রক্তের নীলাচলে আকাশ সঙ্গমী ক্ষুধাকে মিলিয়ে দিতে চাই সর্ব্বতো-চেতনায়। এক অনির্ব্বাণ মহতী নির্ব্বাণে।

যে সুর আলো হয়ে ঝরে তার নির্ঝরের যদি দেখা মিলে যায়,—ভাবছি দেখা হবে কি? কবে পথে যেতে যেতে চরণে বেজেছিল তার ত্রিমিকি ত্রিমিকি দূরগমনের গতি। আজ আর মনে নেই।

সে বলল—কে তুমি?

—জানিনা,

—কবে কোন দেশে তোমার জন্ম ?

—এইটে জানি, জন্ম আমার নিয়ত, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিকালে, দেশ আমার দৃশ্য অদৃশ্য সর্ব্বদেশে।

—কোথায় চলেছ ?

—ঠিক জানিনা কেউ বলে সম্মুখে কেউ বলে পশ্চাতে, নিম্নে বা উর্দ্ধে। সম্মুখ অর্থাৎ যতটুকু দৃষ্টিগোচর, কালের আলোছায়া আমাদের মনশ্চক্ষুতে যতটুকু সংবেদনা আনে আমরা ততটুকু চলি—তদ্বিধ কারণে যা পশ্চাদবর্ত্তী তা অতিক্রান্ত হয় না, শুধু স্বভাবের নিস্ক্রান্তি, নবলক্ষণ ঘটে, সত্তায় নয়। উর্দ্ধগামীতাও এক প্রত্যয়, নিম্ন অবস্থান হয়তো সেই প্রত্যয় অভিজ্ঞা আনে, অসংখ্য অবস্থানের অদৃশ্য আভাস।

অভ্যাস বশতঃ আমরা এক উপবতলার স্থাপত্যালঙ্কারেই যা কিছু অপরূপ তা জানি, নিচের অন্ধকারে বস্তুতঃ তার সৌধ। অনন্ত যাত্রা মানুষের সেই অন্ধ থেকে সেই সৌধোর্দ্ধের স্থপতি আলোকে। তার ধারণা স্পষ্ট হয় আরও আরও নিচে নেমে। নিম্নগামিতা অশেষ, অশেষোর্দ্ধ। মনে হয় শেষ নেই পুনরনুমানেই সব কিছু আরম্ভ নাকি এক অনুলাপ বা পুনরাবৃত্তি মাত্র, পুঁথির মণ্ডের মত তরল ?

দুজনে সেই চেনা চৌরঙ্গীতে দাঁড়ালাম।

মোটরের ধূলোর ছোট ছোট ঘুর্ণীর মত আয়ু, গতি, স্মৃতি। শীতের নদীর মতো বিষণ্ণ স্থির। বিকেলে স্বভাবী উজ্জীবন হাওয়া নেই, কোলাহল ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ক্ষুধার উদয়াস্ত হামাগুড়িতে সহর অশ্লীল, আর্ত্ত প্রাণোল্লাস। আমরা আমাদের যৌবনকে ফিরে পাই না।

অতঃপর মধ্যবীথিকার বহু পথ হাঁটতে হাঁটতে আকাশের নক্ষত্র থেকে কিছু আলো এসে লেগেছিল আমাদের মুখে। নক্ষত্র বা সেই অদৃশ্য আলোর কিছু উদ্ভাস। অল্পদিন হল শরৎ সময়ের তীর ছেড়ে গেছে, তার শুভ্র পালের যে বাতাস লেগেছিল, ফাঁপা টুকরো টুকরো বেদনা বা সার্থকের নীলমণি—তা যেন শুভ্রলেশ্যার প্রত্যয়। বহুদূর আকাশে তার চিত্রার্পিত অস্তাচল থেকে বিধুরা সে বিরহিণী অপসৃত, এক্ষনে নীরব শিশিরের মুখ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। সহর কাকের বিরত পক্ষ্মবিধূননেও রাত্রির লজ্জা নিবারিত নয়, নীরব নয় কুয়াশা। শিশিরের মৌন তরল অভিসার। পথের বিদ্যুতে এখানে সেখানে আলোর প্রহার জাগছে, প্রহার রাস্তাকুড়ের সেই মানুষ ও নারীর আহার চব্বন, বিরাম, আত্মোপকথন, অন্তরাল, অসূয়ার বিভ্রম মর্ষচার। এসপ্লানেডের অন্ধ ঘুমটিতে মানুষের আর্তির শেষ ক্লান্তি, নিদ্রা, নিদ্রা এই রাত্রির।

আবার দেখা হল তাদের সঙ্গে—

কিন্তু তাম্বুরিন সেই মেয়ে কোথায়? এখানে কে হাঁটে, ওখানে কে দাঁড়িয়ে বিলোল কটাক্ষ, শরীরের ভঙ্গ ভঙ্গ অশান্ত যাচ্ঞা জড়িয়ে এক অনুসৃত অভ্যাসের গৃধ্নু দৃষ্টি। লোল পশ্বাচার, প্রাণান্ত ক্লিষ্ট, এখানে গ্যাবার্ডিনের মেদ মোহান্ধ স্থূল জরদ্গব গন্ধ, সাড়ীর প্রচ্ছদে অজ্ঞান আলিঙ্গন, শারীর বিভঙ্গে রাত্রির পিচ্ছিল দাঁতের করাত। এই বিলাস বিক্রীর ভিড়। এই বিলাস বিপনির শ্বাসরোধী চক্ষুর শাসনে একলা আমি আর সে—একলা, সে আর আমি, একলা। প্রতিটি অস্তিত্ব একা, ভ্রূনের একাকীত্বের মত মাতৃ শরীর বিচ্ছেদের সেই প্রকাণ্ড মুক্তির উর্দ্ধমূল অধঃশাখ জীবনের সমস্ত নির্ম্মান

বিশ্বাসোপলব্ধির পরেও আচরণ, অনুগমন—আরম্ভ, শেষ উপস্থিত ধারণায় স্থিত হবার একক প্রত্যয়।

যন্ত্রণা, আর যন্ত্রণা।

সমাজ—সংস্কার, সব শব্দের বিভ্রম। বললাম।

—সে বলেছিল—বদলাও না কেন ?

পথ জানা নেই।

—বিপ্লব, বিবর্তনের পথ।

—পশ্চাদগমনে স্পৃহা নেই, অস্পৃহাও নয়।

বেঁচে থাকার যতটুকু আকাশ ছিল, শকুনের পক্ষবিধূনন সেখানে, সেখানে ভবিষ্যের ভয়।

—বিশ্বাস আনো।

পুরাতন ওষুধ—রোগ সারেনি।

—ঈশ্বরে ?

অদৃশ্য প্রমাণাভাব।

—অনুভব কর কিছু ?

—না—তবে আলোর কম্পন আছে শব্দের তরঙ্গে, অদৃশ্য আলোর ওপারে আলো আরো আলো তার কিছু চোখে এসে পড়ে অনেকটা তবু না। অনির্দ্দেশ্য ; অনির্দ্দিষ্ট কিছু আছে কোথায়, কি তা জানি না। জানি না এই না কি বস্তু, নিজেকে এই নাস্তিতে মিলিয়ে দিয়ে জানো।

রাষ্ট্রের যতশত রটনা—স্বাধীনতা সভ্যতার, তার নিচে অনেক খাদ। ভয়ঙ্কর বিষবাষ্প জমা, ভয়াল করালীর রক্তপিপাসায় অন্ধ অসুর ধ্বংসোম্মাদনা, না আর না—অতঃপর কিছু নেই।

বললাম—সৃষ্টি সুন্দর, তদোধিক সুন্দর যে স্রষ্টা, প্রেম সুন্দর—

অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রেমিকের মন। আলো—বোধি, অন্ধ তমোর নির্বান, সৃষ্টি। এক লোক থেকে নবলোক লোকোত্তরে আমরা চলি।

আরও ভীড়, একটু স্থান দাও, একটু ক্ষুধার স্বস্থ সেবা, কামনার করুণায় সৌম্য হোক এইসব মুখ। একটু খুঁটিয়ে দেখ, মস্‌ন সব যা কিছু মানবিক আভাষ—মুখ চোখ থেকে মুছে গেলে দেখবে এইসব মানুষের মুখ পশুর মত, হননাচার মানুষের অভ্যাস।

—আমরা হলুদ ঘুমের কবরে এক হত্যার আততিতে রাত্রির কফিন নামিয়ে দিয়েছি। বহু যুগ ধরে এমনি চলেছিল। ভোরের আলোতে সেই কবরের ধুলো লেগে আছে। কবে আমরা এই পাপ স্বীকার করব। আমরা, আমরাই, আমি, যে শ্রীমতি তাকে হত্যা করেছি, শ্রীযুক্ত সে আমারই আঘাতে মরেছে।

কাগজের থেকে মুখ তুলে কোনও অন্ধকারই যথেষ্ট মনে হয় না নিজেকে লুকোবার, নিজের ভয়ানক আচরনের আতঙ্ক ভোলবার। পালাও আমা থেকে পালাও। আমার থেকে আমি মুক্তি চাই, আমাকে আমি ভয় করি; এই মানুষকে, মানুষ পশুকে মুক্তি দাও ঈশ্বর—হে শূন্যতা, আমার মিনতি শোন।

আমার কান্নায় সব ধুয়ে যাক্, শুভ্র হোক এত কালো, সমস্ত আশ্লেষ অপরা বিভৎসের।

না, পালাবার বা অন্য কোনও গ্রহাবস্থানের সেতু আমরা কোনও দিনও নির্ম্মাণ করেছিলাম কি? অনন্ত দ্বৈপায়নের সে অবস্থান ত্রিলোক ব্যাপী যন্ত্রণায় হাত ধরে আছে। অন্য কিছু ত্রিযামা অতীত প্রত্যুষে আশ্বাস নেই।

ভোর সে এক সর্প রজ্জু!

কি জানি মনে হল কত কাল তার মুখ দেখিনি। অথচ কত কত বসন্তের নিঃশ্বাস মিলে আছে, মিশে আছে তার বিধুরা পটে। সমুদ্রলীন ঢেউ—স্বপ্নের নীল দিঠি আর মুঠি মুঠি রক্তাশোকস্মিত তার মুখ। যে আমারে ডাক দিয়েছিল ক্রান্তিকালের এক উজ্জ্বল প্রহরে, সে দুর্গম অভিসারে অনন্তকালের রাধা অধরা কৃষ্ণের মোহন বাঁশী শুনেছিল। আর শুনিনি—উতলা হইনে বাঁশীতে। শোক হ'ল।

—তার দেখা পেয়েছিলে?

—হাঁ অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল এই আমি হাত পেতে নিলেম তোমার দেওয়া তোমার শ্রেষ্ঠ কিছু, এই যৌবনের অধিকার, এই গলায় পরলেম তোমার হার। সেইটুকু সময় অনন্তকাল জুড়ে রইল।

—সেই সব। তারপর দেহটা জীর্ণ হল চোখের দৃষ্টি গেল, পা'টা চলল না আর।

—পিছনে তাকিয়ে দেখি দাহ দিনের পোড়ো মাঠ।

—যেটুকু নিয়েছিল সেটুকু তো খোয়া যায়নি।

—কি জানি।

বট বৃক্ষের স্তব্ধতায় ছায়ায় তার আসন পাতা আছে—সেখানে শোক নেই আছে শান্তি। চলেছি যদি সেখানে তার দেখা পাই—

ততক্ষণে আমরা মরাগঙ্গার সেই সেতুটার কাছে পৌঁছেছি। ও দিকে ময়লা গলির পথের বাঁকে কেউ বাজার করে ফিরছে, কেউ বা অফিস সেরে, কেউ দেবতার পায়ে ফুল ও পয়সা মানত জানিয়ে। কাছের ভাড়াটে বাড়ীর ঝগড়ার চিৎকার শোনা যায়। ও দিকে ফুল ধূপ চন্দনের গন্ধ ভেসে এল, অন্যদিক থেকে রান্নাপাটের ধোঁয়া,

আর একদিক থেকে নারী দেহের শীৎকার মেশা বাতাস, আর মৃত দাহের গন্ধ।

এই পথ। সুন্নোত নাসা বন্ধুটির নাক উত্যক্ত হল, বললে—নারী দেহের শীৎকার মেশা বাতাসে তার নাসারন্ধ্র রত। মিলিয়ে আছে সে এই ভুতুড়ে অন্ধকারে যেখানে ওদের শরীর মেশা—এই দ্বৈতে, ক্লেশে, ক্ষীণ স্রোতে, অফলা সৃষ্টির একতন্ত্রে। এই সড়কের ওপারে নদীর সরিক আর এক জীবনে অনন্ত সৃষ্টির এক সুন্দর সাফল্যে আমরা অশোক শান্তি খুঁজেছি।

পৃথিবীর বহুপথ এই ময়লা গলির পথিকদের পায়ে বাঁধা, তারা তাদের যন্ত্রণা থুয়ে গেছে এখানে। এই মরা গঙ্গার সেতুর ওপারে—ওদিকে দেবীর আলয়ে ফুল চন্দন ধূপের গন্ধ—এদিকে শবদাহের। অন্ধকারে তার উন্নত নাসাটি ফিরিয়ে দিলেম সেই শবদাহের গন্ধ যেদিক থেকে এল সেদিকে।

কে যেন হেসে উঠল—অন্ধকার কেঁপে উঠল, চেয়ে দেখি সেই রিক্সাওলা। যার মুখে অপার দয়া, এক গাল দাড়ি দিয়ে ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণের সরলতা।

—হাসলে কেন রিক্সাওলা?

বললে—এমনি। দেখছ না?—দূরে দেখিয়ে দিলে শীতার্ত্ত এক সারমেয়।

অভ্যাস মত আমরা রিক্সায় উঠতে গেলুম।

রিক্সাওলা বললে—আজ মাপ করবেন, অন্য সোয়ারী আছে।

রাগ হল, এত মদ খেয়েছিলুম এখন আর উন্মাদনা নেই, আছে শ্রান্তি, শরীরের বিকার, তাছাড়া রিক্সাওলা আমাদের থেকে আশাতিরিক্ত পেয়ে তো থাকেই—

বললাম—রিক্সাওলা তুমি বেইমানী করছ।

—না বাবু আরো বেশী বেইমানী হবে যদি ওকে না নিয়ে যাই। বললে সে।

অবাক হয়ে গেলেম তার কথায়, শীতার্ত্ত সেই লোমহীন জীর্ণ সারমেয়েটিকে কোলে করে তুলে নিয়ে রিক্সায় তুলে নিলে।

—ঘর ছেড়ে চলে এসেছে ও পিছু পিছু, খুব কষ্ট ওর, একটু হেসে বললে—আমার ও যে আর জন্মের কেউ বাবু?

—কে?

জানিনা তবে মস্ত কেউ। তাকে নিয়ে যাচ্ছি।

টুং টাং টাং টুং, রিক্স চলেছে, নীল বাতিটি জ্বলছে বেদনার নীলকান্ত মণির মত। টুং টাং, অনন্ত আততির ঝঙ্কার রাত্রির অন্ধকারে মিশে আছে, টুং টাং টাং টুং রিক্স চলেছে, দুটো চাকা—দুটো পা। একটি বুকের উজ্জ্বল বিশ্বাসে শত নিরাশ্বাসে, অন্ধকারে পথ কেটে চলেছে—

তার সুর—টুং টাং টাং টুং টাং ভেসে এল। অনন্ত দুঃস্থতাকে হৃদয় দিয়ে লালন করেও যে এক সরল বিশ্বাসে স্বস্থ—সে, জানে তার মস্ত কেউ বা ছিল বহু জনমের সঙ্গে যার প্রেমের একত্রতা, তার চলার নুপুরের সুর বাজছে টুং টাং টাং টুং বেদনার নীল বৈদুর্য্যের সে আলো—নক্ষত্রের অপরিমিত যোজন দুর হতে হঠাৎ সে আলো এল যেন—সেই ধ্রুব মণ্ডল হতে বহুদূরে আমরা তখনও দাঁড়িয়ে। শুনলেম সেই রাতের রিক্সার টুং টাং অনন্ত কালের সুরে সাড়া তুলেছে।

অন্য এক ভোর বেলাকার সুন্দর স্বপ্নে সে সুর জেগে উঠছে। বন্ধু আর আমি সমস্বরে বললাম—কে তুমি আমাদের সেই ভোর-বেলাটি ফিরিয়ে দেবে!

রাত্রি

দিন গেল—পতত্রের নীরব নিভৃতিতে তার চোখের আলো ইসারায়।—কে ডাকে, কে, একলা যে সহস্রাব্দের নিঃশব্দে চৈতন্যের অগম দেশে জেগে থাকে, তাকে আলো আর একচক্ষু সূর্যের ওপারে মগ্ন মোহনায় কে ডাকে?

রাত্রি। রাতে আর ঘুম এল না। মশার গুঞ্জন, ঝিঁঝিঁর কান্না শুনলেম, কুকুরের হঠাৎ কাতরানি ক্লান্ত ক্লিন্ন হল, আর কারো কাশির দীর্ঘায়ত স্বর, অন্ধকারে মুঠো মুঠো অন্ধকারকে দীর্ণ করে অম্লান তারার ঘুমহারা রাত্রি যেন মৃত্যুকে হাত ধরে নিয়ে চলেছিল কোথায় জানিনে।

তাকিয়ে দেখি রাত্রির এলো চুলে অনেক অসংখ্য ঠোঁট চুমিয়ে আছে, বেদনার নীল বৈদুর্যে আশ্চর্য এক আশ্চর্য খবর তারার অক্ষরে কেঁপে ওঠে, দেখি অনেক কথায় ঘুমের ঠোঁট ক্লান্ত, চোখে তার অনাদ্যন্ত কালের বিস্মৃতি।

নীল গল্প। ক্লান্ত কান্তি-দ্রাক্ষাইব তনু তার আদিম আলস্যের লাস্যে লীলায়িত, নৃত্যের হিন্দোল তার রক্তে, উটের মাংস ঝলসান তাম্বুরিন চমকান বিলোল অলাত চন্দ্রাতপে; রিমিকি রিমিকি তার চোখের দৃষ্টি।

—পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ—তুমি কী গৃহহীন বেদুইন, পায়ে তোমার শিশিরের আর্তি?

সে পথ মরুতায় তার দেহ যেন তালিপত্রছায়া, নিবিড়; নিস্বন তার বঙ্কিম ঠোঁটে অনুচ্চার আত্মীয়তা।

সে আমার অনেক কালের পরিচয়—যার কামনায় মন্দিরের গর্ভগৃহে থমকানো ছুটো চোখ নুপুরের রিনিঝিনির শেষ রেশে প্রদীপের আলোয় আনত, এবং সুপ্রাচীন প্রেমে ক্লান্ত, প্রগাঢ় কামে ক্লিষ্ট; অনধীত আশায় আর অস্তিত্বের অন্তঃস্থিত বেদনায় সে মিশে আছে।

গোপুরমের আড়াল থেকে শোনা গেল—পাপের গোপন লিপ্সা মিশিয়ে আছে হাওয়ায়,—বহু মরণের পারে প্রভূত ধূপ চন্দনের গন্ধ আর বেলি চামেলির ব্যাকুল বিলাস কবরীতে পিঠ ফেরান রহস্যময়ী রাত্রি—আসন্ন আশাবরীতে তার দেহ ঢাকা। মন্দির-অলিন্দে সব ঘণ্টা স্তব্ধ, তেমনি তার স্তনভার নিঃশব্দ ঘণ্টার মত অন্ধকারকে জড়িয়ে আছে দেহে।

কবে কোন শিশির টলমলো সকালের এক আকাশ আর তার আঁখিতারার অনন্ত স্বপ্ন—অপার সুরের অবগাহনের রঞ্জন নিয়ে তাকে ছুঁই যার শঙ্খমালার রক্তিম ঠোঁট চুম্বনে চুম্বনে আমাকে অনেক মরণে করেছে অমৃত—মনে হল এই পৃথিবীর সেই সব জ্রূণে অন্তহীন পিপাসা ঠোঁট মেলে আছে।

আর একদিন দরজা হাট করে পথে এলেম। মহেঞ্জোদারোর খোলা পথ! চলেছি। বর্ষার নদী অনেক দূরে গৈরিক বালি বিছিয়ে উজানে নেমেছে, রাতের পাখীরা ঝুপ ঝুপ করে স্নান সেরে উড়ে গেল, বড় বড় শস্যের গোলায় ইঁদুরের উদগ্র আহার সমাধার সাড়া জেগেছিল তখন—শ্রান্ত পণ্যা মেয়েরা স্নান সেরে নগ্ন পিঠে চুল মেলে দিয়ে পথে সারি বেঁধে চলেছে—দ্বাদশী চাঁদিনীর সাদা মেঘগুলো একঝাঁক পাখীর মত নিমেষে হারিয়ে গেল।

আছি তদবধি—জাননা কর্ম্ম আমার কাঁধ জোড়া, হাতে তারই

করলেখা, সেখানে শাস্তির গানে কোমল গান্ধারকে আমার হাতের বোনা শস্যই সরব করেছে স্বরে—আর সেই সব পণ্যা মেয়েরা যখন অলঙ্কারে দেহ সাজিয়েছে তাতো আমারই মনোরঞ্জনের জন্যে, আমারই জন্যে প্রসাধন করে তারা প্রোষিতভর্তৃকার বেদনাকে মনোরম অবৈধতায় দেহ দান করে সমাজকে করেছে ধিক্কৃত।

তখনও শুনেছি কোনও পুরনারী বলেছেন—দুঃসহ দিন দুরাকাঙ্ক্ষা ওদের, দেখ, দেখ আমার দাসীরা অলঙ্কারে দেহ সাজিয়েছে। ওরা জানালা বন্ধ করে দেয় না কেন?

—কে?

ভীত অথচ সরব সেই প্রশ্নে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেম। দেখলেম নিরাভরণ তার মৃণালভুজ শায়িত কোন মানুষের শির স্পর্শ করে আছে—তার বিরল কেশ মাথাটি চর্মবিশ্লিষ্ট করোটির মত ভয়ঙ্কর, লোভ লোলুপতার সন্দিগ্ধ পাহারা তার দেহ জুড়ে।

আমি নিশ্চিত তার ভয়ঙ্কর জ্যোতির্লেশহীন পাথরের মত চোখ দুটি দেখেছিলেম, নিষ্প্রভ আলোয় সেই নারীর স্থির প্রতীতির সঙ্গে মৃত্যুর অনিশ্চিন্ত অনাত্মীয়তা সেই মৃত্যুপথযাত্রী পুরুষটির অসহায়তাকে নিশ্ছিদ্র জালের মত আবরিত করেছিল।

মহেঞ্জোদারো নয়—আধুনিক কালের এই আমি আমার ঘুমহারা রাত্রির ঠোঁট থেকে কটি কথা ছিনিয়ে এনেছি, বললেম—আমাকে চিনবে না তুমি, অথচ আমাদের চিরকালের পরিচয়।

আমি তোমারই প্রতিবেশী। প্রতিদিন আমি এই রাত্রির সহযাত্রী। দেখি এখান দিয়ে যখন তুমি চলে যাও যেমন সকাল সাঁঝের চলায়, আকাশে তারা ওঠার সাথে, ভীরু হাওয়ায় হাত

খাড়িয়ে ডাকি, একলা কাঠবিড়ালীর ত্রস্ততায় ঘাড় ফেরান ধনুকের ছিলার মত বাঁকা হয়ে থাকি, ঝরা পাতা ধূলোয় ওড়ে ঘাসে—কে আসে—মনে হয়, কেউতো তবু আসে না। অনামা সেই ত্রিযামা সহচরীকে অনেক দূর থেকে খুঁজে খুঁজে চলে এলেম—বহুদূর অনেক কালের কনকচাঁপার রঙ ধরা চোখ তার ক্লান্ত গাংচীলের কান্নায় কাঁপা—নীল আকাশের নিথরে নিঃশব্দ কাহিনী কত কী যেন বলে।—কিন্তু এতশত যন্ত্রণায় হাত মেলে আছ কেন তুমি, সেই কথা বল, তুমি কে?

—আমি সুন্দর। আমি শৃঙ্খলিত, এই আমার উজ্জ্বল সিন্দুর!

—জানি দুশ্চিকিৎস এই ব্যাধি দেহের ও মুমূর্ষু মনের নিরবলম্ব এক আকুতি যন্ত্রের মত তোমাকে প্রাক্তন বিবাহের মন্ত্রে বেঁধেছে।—

থর থর করে উঠল ঠোঁটের পাতা—এক ঝলক হাওয়ায় বৃষ্টি বাঁধা পাতার মুখ থেকে ক'ফোঁটা জল সরে গেল,—চোখের তারায় আঙুরের অম্লানাভা জেগে উঠল—বয়ঃসন্ধির গলা সোনার মন তার সমস্ত মুখখানা যেন আয়না! দেখলেম আমার সমস্ত সাহস, সৃষ্টি জুড়ে সেই কাল অজেয় পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে চলেছে। মনে হ'ল খুব চেনা না হলেও এতাবৎ যা কিছু একটা রহস্যের রাত জাগা পাখী নীড়ের নীরবতায় বহুদূর থেকে আকুল হয়েছিল, ঠোঁটের ক্ষুধায় সে তার সঙ্গিনীকে এখন মুখর করে দেবে। দীর্ঘ এলান চুল রাত্রির চিক্কন ত্বক কপোল চুম্বন করে নেমেছে, সেখানে মুঠো মুঠো মৃত্যুর সার্থকতায় বহু জনমের স্বপ্ন স্থির হয়ে আছে। আমার দৃষ্টি শিলীভূত কঠিন হয়েছিল।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—জানি—

—সতর্ক ইঁদুরেরা নর্দ্দমা ডিঙিয়ে ডাঙায় হাঁটছে। জানি বিকেলে

যখন আকাশ শ্লেটের বিরাট শতরঞ্চে ছ'টাঋতুর চতুরালিতে চিলের উড্ডীন গৃধ্নু তায় গা ভাসিয়ে দেয়, রোজই ভাবি ইন্দ্রনীল সভার শ্বেত ঐরাবতের বৃংহতি শুনেছি, তখনও আশা-দুরাশার মেঘ রোদ্দুরের মত আমি চেয়ে থাকি। আর আমার প্রেম সে কোন রমণীর সহমর্মিতায় অনূঢ়া রাত্রি শেষে আর এক অন্ধ কবন্ধ দিনের আলোয় জেগে ওঠে? এমনি দিন আর দিন—নেই কিছু নেই—।

—তারপর?—বিবাহোত্তর শরীরের নিঃশেষ রক্তবিন্দু ভগ্নসেতুর প্রায় আর একটি যৌবরাজ্যের পতন ঘটালে, যে দেখলে নিদারুণ অন্ধে এক আবর্ত নিয়তি—মগ্ন বাসনারা দলিত কুসুমের মত। তবু আশা আর আশা, রোজ সূর্যোদয়ে মনে হত সমস্ত আকাশ আমার মনের আয়নায় বুঝি ঝলমল করছে, গাছের পাতার অস্থির আবেগে আমার ইচ্ছা সবুজ সুন্দর হয়ে উঠছে যেন—।

চুপ করেছিল সে। কটা পেঁচা উড়ে গেল, ছায়া নামল, ডানার হাওয়া জাগল। অজানা ছিল না, অভাবিতও নয়—চিনলাম। দরজা খুলে গেছে।

কাছে গেলেম। বাঁ-গালের তিলটা আশ্চর্য আশ্চর্য ওর। মনে পড়ছে আরো কাছে থেকে তাকে দেখেছিলেম আমার তন্ময় সত্তায় যার সুরের স্নান দীঘির মত শান্ত স্নেহময়। তারই মত মুখ। ঠিক যেন বন্য কোনও নাম-না-জানা রক্তপুষ্প শোণিমা তার কপোল জুড়ে—অমাবস্যা তিথির স্থির স্থির রাত্রির পিচ্ছিল সর্ব্বনাশে কেশরাজি এলিয়ে পড়েছে পিঠপার্শ্ব জুড়ে।

—তোমাকে চিনি। চোখে নীল মেঘ কেটে বিস্মৃতিবিদ্যুত চমকাল।—ছোটবেলায় বকুল কুড়াতে, কুল পাড়তে, পড়তে যেতে

পাঠশালে। শাপলা ভাসাতে, দুরন্ত খুশী, দুর্বার কান্না ছিল তোমার, শীর্ষাধার মন একদিন ঋতুমতী হয়ে কেঁদেছে তাও জানি।

আর তোমার কান্নার চোখ উপছে অনন্তকালের স্বপ্ন মধুর হত। হেসেছ যখন শরতের নীল আকাশে আলো তার আঁজলাভরে দিয়েছে, ফুল ফুটেছে—তোমারই কোমল হস্ত স্পর্শচয়নোন্মুখ খুসীর অনন্ত ইচ্ছায় সে হাত বাড়িয়েছে—অদ্ভুত অপার রোদ্দুর উদ্ভাসে ছায়া-করা-কাল।

মনে পড়ছে সুজাতার স্নেহধন্যা দয়ার্দ্র এক ক্ষণ, তথাগত যাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন একদা—তারও আগে ত্রিষ্টুভ ছন্দের ঋষিরা যখন প্রাণময় শস্যের সত্তাকে মন্ত্রঃপূত করেছিল—অথবা একদিন মহেঞ্জোদারোর স্নানঘর থেকে যারা ফিরেছিল, তদবধি কালহীন আমার সকল বাসনার ধূপ জ্বালান রতির মত ঘণ্টা বাজছে আর বাজছে মাতৃত্বের আহ্বানে আজন্ম সে আমার প্রেমকে লালন করেছে। তাই রোজ রাতে আমার নিদ্রাহারা কাহিনীর কিছু তোমার অবাক ঠোঁটে উন্মুখরতা কামনা করে। অস্থির আবেগে আমার অস্তিত্বের যন্ত্রনার কিছু তোমার ঠোঁটে রেখে যেতে চাই—বলেছিও তাই।

রাত্রির চোখে রিরংসা আরো করুণ হল—ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর মনে হল রাত্রির ভাষা। দাহ দিনের এক-খা-খা মাঠের স্মৃতি তার সিঁথির সিন্দুর অসহায়তায় অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

ফিরেছিলেম। আলো জাগছিল, এতাবত কটা রাতের পাখী ডুকরে কেঁদে উঠেছিল অনেকদূর থেকে—তাদের নীড় ভেঙে গেছে!

অপনয়ন

একটা দুঃস্বপ্ন—দুরপনেয় যার স্মৃতি, জীবনে যা ঘটলেও তাকে অস্বীকার করেই বেঁচে থাকতে হয়। যদি আমাদের পাপবোধ নীতির পাতাবাহারে আমাদের অস্তিত্বকে ঢেকে না রাখত তবে বিবেকের প্রচ্ছায়ে এক আদিম শিশুর কান্নায় আমরা বিবর্ণ হতাম। আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারে আরো আরো গভীরে সে কান্নার তো ক্ষমা নেই, মাতৃঅঙ্গ বিচ্ছেদের যে ব্যথা তাকে নিরন্তর প্রহার করে তারও কোন প্রতিকার নেই।—বোবা। এসব কথা একদিন আমার জানা হয়ে গেল। একদিন আমি ঝড়ে তাড়া খাওয়া পাখীর মত নীড়ে আশ্রয় পেয়েছি আর একদিন অসহায় যন্ত্রণার বোবা ব্যথায় প্রাকঅস্তিত্বের ভ্রূণে মাতৃগর্ভে বিলীন হতে চেয়েছি।

মধ্য প্রদেশের একটা বুনো গাঁয়ে এক মনোরম বন্যতা নিয়ে আমার কৈশোর কেটেছিল ছোট ছোট শাল শিশুর মত ধাঁধাঁ করে বেড়ে উঠলুম আমি, আমার ছোট ছোট হাত দুটো চিতার থাবার মত ক্ষিপ্র ভারী হয়ে উঠল, মেঘ বিস্ফারিত তারার মত টলমল করে উঠেছিল আমার দুটো চোখ আর চাতকের মতো আমার ঠোঁট তৃষ্ণার জল খুঁজেছিল এক দূরাধিগত নির্জ্ঞানে—আমার মা তখন তিরিশও পেরুন নি।

আমাকে যখন বুকে করে তিনি আদর করতেন তখন আমি কি বুঝেছি যে তাঁরই গাছে ফোটা ফুল আমি সেটা তাঁর চুলে মুখ রেখে বার বার কি মনে হয়েছে। আমাকে বুকে টেনে দুরন্ত করে তুলতেন

তিনি তাঁর স্নেহে। সব ছেলের মত আমিও মার বুকের লালনে আর মুখের কথায় বড় হয়েছি, ভাষা পেয়েছি।

ফরেষ্টারের কাজ ছিল বাবার, শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি মানুষ, গম্ভীর ছিল তাঁর মুখ, আমি আজও মনে করতে পারি নিদারুণ হিংসুক ছিল তাঁর চোখ, অতন্দ্র পেচকের মত যে চোখ অন্ধকারে জেগে থাকত। আমি ভয় পেতুম তাঁর সান্নিধ্যে সদা শাসনে। রাতে জেগে যখন তিনি বিড় বিড় করে বকতেন, বলতেন—মালু তুমি তুমিই ছেলেটাকে নষ্ট করলে, ও মানুষ হবে না। তখন নিদ্রাহারা রাত্রির নিদারুণ অন্ধ আমার চোখে কী যে ভয়ের ছবি এঁকে দিত আজ আর মনে নেই।

মা তখন অফুরন্ত তৃপ্তিতে আমাকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতেন কোনও প্রতিবাদ, বিসংবাদ বা সাড়া জাগত না আমার মা'র মনে।

আর যার মুখ রাতে দেখে আমি ভয় করতুম, ভয় করে বিদ্বিষ্ট হতুম, পিঠ ফিরিয়ে সাহস খুঁজতুম মার বুকে—ভোরে জেগে দেখতুম খাকির প্যাণ্ট আর জামা পরে বাইসাইকেলে অনেকদূরে রাঙা মাটির রাস্তায় বাঁক নিয়ে চলেছেন তিনি। আমার বাবা—কাজ পাগল মানুষ নাকি তিনি কুলি কামিন কেরানীর তদারক করে অনেক সময় নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতেন। এদিকে চায়ের পাট চুকিয়ে অফুরন্ত অবসর রইত মা'র ঘরে, ভৃত্য সাঁওতালী কিশোর যখন আনাজ আর মাংস নিয়ে হাট থেকে ফিরত, তখন রান্না শুরু হ'ত—সে সব সকাল বেলা সমস্ত সময় আলোর বলয় দু'হাতে বিলিয়ে যেত, মনে পড়ে সেই বিনম্র রোদের ঝিলিমিলি ছায়া, কৃষ্ণচূড়া আর কদমের শালমঞ্জরীর সারা দিনের চাওয়া নিয়ে, সেই সব গাছের পাতার হাওয়া লাগা, গান গাওয়া দিনের শুরুতে মার কাছে ছড়ার পড়া ঝিলিতি কিশোরদের

ছবি দেওয়া বইয়ের কথায়, আমি যেন হাজারও মরণকে জয় করেছিলাম।

আর কখনও মা'র মুখের কলি কলি গানের সুর—আমাকে কখনও মনে করতে দেয়নি সেই ভোর বেলাকার স্বপ্নের বাইরে রয়েছে আরও একটা জগত—যেখানে কঠোর পরিশ্রম, কঠিন প্রকাণ্ড শালের গুঁড়ি বওয়া নোয়ানো পিঠ, সারি সারি মানুষ যেখানে দিন গুজরান করে।

ইঞ্চি ফুট গজ করে মাপা জারুল দেওদার বনসেগুন, ধূর্ত্ত কনট্রাকটারের কালো গৃধ্ন, ঘুস দেওয়া হাতে, গোন্দ মেয়েদের ভীত সকরুণ দেহ সমর্পণের নীরব রটনা সকালের পবিত্র আকাশ খান খান করে—বিলাসপুরের জঙ্গলের অন্ধ মাথায় দুপুর রি-রি করে কেঁপে ওঠে সেখানে।

তখন কি বুঝতুম ? এত জানিনে, বুঝিনে, হঠাৎ হঠাৎ উঠোনে মুরগী খরগোসগুলির পিছনে দৌড়ুই আপন খুসীতে, আনাজের বাগানে মটরফুলের বুকে মুখ লুকিয়ে রাখা মটরশুটি ভেঙে মুখ ভরে খাই, আর কখন মা দৌড়ে আসেন আমাকে ধরতে—দুরন্ত হয়ে উঠত আমাদের ছুটো ছুটি।

কিশোরের গুলতি নিয়ে বাঁদর খেদাই তখন মা ও আমাদের খেলার সাথী হ'তেন।

—তাড়াও তাড়াও—ওরা কচি লাউ খেয়েছে শসা—ওরা আচার চুরি করেছে রোদে রাখা বোয়ামে নির্ব্বিচারে নোংরা হাত ঢুকিয়ে, দাঁড়ে ঝোলান ময়নাটা ভয়ে পাখা ঝটপটিয়ে অস্থির হয়েছে ওদের জ্বালায়—হনু বড় জ্বালাচ্ছে তাড়া ওদের তাড়া, ওরা যাক্ রাবণ রাজার দেশে সেখানে আগুন জ্বালাক। মুখ পোড়া।—সে সবদিন

হঠাৎ কি আমার মনে হয়েছিল আমার মা যেন বন্দিনী সীতা, অশোক বনের সবুজে কী যেন এক অবুঝ শোকে বাঁধা পড়েছেন ? মনে পড়ছে এমনি একদিন হাঁপিয়ে ধূলো মেখে কাঁটা বিঁধে আমরা যখন ফিরে আসছিলুম আমাদের চোখের সামনে দুটো হিংস্রুক চোখ জ্বলে উঠল।

—তুমিও ছেলে মানুষ হয়ে উঠলে, বয়েস হয়নি, মা হওনি, তুমি কিনা ওদের দুরন্ত পনায় আরও সলতে উস্কে দিচ্ছ। প্রচ্ছন্ন অভিমান আহত অনুযোগ—তিরস্কারে সরব হয়ে উঠল বাবার অস্তিত্ব।

—বেশ করছি। মা পিঠ ফিবিয়ে বলেছেন,—তোমার না হয় স্থবিরতা এসেছে আর আমার দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে, তোমার বন পাহারার কাজ, আর আমি বনে থেকে আরও আরও বুনো হতে পারছিনে এইটুকু লাভ, এই বেঁচে থাকছি তোমাকে ছাড়া আর সবকিছু নিয়ে।

—মানে ?

—মানে তোমার চেয়ে সকলের প্রাণ আছে অনেক বেশী যারা প্রাণের নিয়মে চলে যারা স্বাভাবিক আর সুন্দর, তুমি কলের নিয়মে চল প্রাণ তোমার কলের কাছে কাটা পড়েছে, তার রক্তে শুধু হিংস্রুক হিসেব।

টাকা আনা পাইয়ের সকাল বিকেল, আর দেহের যত বিকার নিয়ে আমার কাছে আছে তোমার বিপর্যস্ত ক্ষুধার দাবী, তোমার আরাম তোমার নিরাপত্তা। তুমি তাই ছেলেটাকেও সইতে পারনা দূর দূর কর তাড়াও। হিংস্রুক, লোভী একটা স্থূল মাংসপিণ্ডের মত কনানডয়েলের বইয়ের ছবির মত একটা জানোয়ারের ছবিতে বাবার মুখটা হারিয়ে গেল।

—কি বললে—সরে যাও, যাও। আমিই ওকে শাসন করব। মাকে ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে দুটো ভীষণ হাত এগিয়ে এল—ওকে আমিই শাসন করব ওকে ধূলো থেকে এই বুনোমি থেকে বাঁচাতেই হবে। আর তাছাড়া ও হয়েছে আমার জীবনে অভিশাপ!

—অভিশাপ? না না ওকে কিছু তুমি বলতে পারবেনা, ও তোমাকে ভয় করে ঘৃণা করে। এইটুকু ছেলে সেও তোমাকে ঘৃণা করে, বোঝনা?

—বটে। চিৎকার করে উঠলেন বাবা, আজও আমার মনে আছে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাকে সরিয়ে দেন বাবা, মা ঘুরে পড়ে গেলেন, মাথা লোহার গেটে লেগে কাটল, রক্তও ঝরল।

ভয়, ভীষণ কুটিল অন্ধকারে তার মুখ চোখ আমাকে সতত তাড়না করলে,—এই আমার রাত্রি দিন। কৈশোরের যতশত উদ্ভিন্ন আশা ও স্বপ্নকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন আমার বাবা, আমি তাঁকে ঘৃণা করেছি—বিভৎসকায় বস্তুর মতো, আমি তাকে ভয় করেছি হিংস্র শ্বাপদের মতো।

মনে পড়ছে অমন ফুটফুটে সুন্দর মুখ আমার মা'র ক্রমাগত নীল বিশীর্ণ পাণ্ডুর হয়ে এল, এলান একরাশ কাল চুল শনের মতো সাদা হয়ে গেল। একলা বসে রাশি রাশি ভাবনায় দিনের আলোকে রাতের অন্ধে ডুবিয়ে দিলেন। মার কঠিন অসুখ হল।

নীল অপরাজিতা মলিন হয়ে গেল আমার চোখে, বাগানের শুকনো পাতা আর উদ্ধত ঘাসের মাথা ছাড়া শিশু মরশুমী ফুলেরা আলোর মুখ দেখলেনা, মুরগীগুলি মড়ক লেগে মরল, খরগোসগুলিও একে একে উধাও হল। আর মা'র একমাত্র আত্মীয় কিশোরও একদিন

বাবার হাতে মার খেয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল কোথায় জানিনে।···আমি একলা,—মার কাছে গেলে বলেন—গেছে সবাই গেছে, কিশোর, সেও গেছে ময়নাটাকে উড়িয়ে দিস্ কিন্তু তারপর। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদেন তিনি পায়রার বুকের মত করুণ থর থর করে ওঠে মার বুক।

আর আমি যেন মৃত্যুর মুখ দেখতে পাই, দেখি সে তার রক্ত পোষাকে শান্ত স্থির হয়ে আছে, অপলক তার দৃষ্টি কঠিন তার তর্জ্জনী আর আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার মাকে আড়াল করে, এমনি দিনের পরদিন আমার ছোট্ট অস্তিত্বে বোবা অবুঝ এক বুক কান্না—মার কঠিন অসুখে জেগে থাকা মলিন মুখের আকুতিতে আর্ত হয়ে উঠল। লড়াই করল আপ্রাণ, হারল।

আরো কিছুদিন বেঁচেছিলেন মা আরো কিছুদিন ভোরের আলো রূপরস গন্ধ স্পর্শময় পৃথিবীর স্বপ্ন তাঁকে ধরে রেখেছিল, এমন দিনে খবর পেয়ে কলকাতা থেকে এলেন বিলুমাসী আর আমার বৃদ্ধ দাদু।

বিলুমাসী বয়সে আমার থেকে হয়তো খুব বড় ছিলেন না, মার মত আয়ত নিবিড়পক্ষ তাঁর চোখ, স্নেহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমাদের সংসারে। তাঁর মিষ্ট প্রাণময় হাসির অন্তরঙ্গতায় সজীব হয়ে উঠল শ্বাসরুদ্ধ ভীত সেই সবদিন।

অনেকদিন আবার সেইসব দুরন্ত দিন আমার পায়ে বেজে উঠল, আমি আর বিলুমাসী খরগোস নিয়ে এলাম হাট থেকে, একঝাঁক পায়রা পুষলাম, অনেক দূরের জঙ্গল থেকে ময়না তিতির সংগ্রহ করলাম, বাগানে আবার মরশুমী ফুলেরা মুখ দেখলে।

—এ গাছটা আমার ফুল ফুটেছে, ক্রিসেন্থিমাম—বিলুমাসীকে বলতাম সগৌরবে।

—মিথ্যা বলনা, ওটা আমার হাতের আর এই গোলাপটা, বিলুমাসী কটাক্ষ করতেন।

ঝগড়া তুমুল হয়ে উঠত, দূরে বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে থাকতেন মা, স্মিত মুখে আমাদের ঝগড়ার নিষ্পত্তি করে দিতেন।

কটা দিন মা আমার হয়তো সুখ বোধ করলেন, হয়তো বিলুমাসীর মধ্যে তাঁর কিশোর হাওয়া লাগা দিনের কিছু খুঁজে পেলেন, কিন্তু সে আর কত কাল ?

একদিন বিলুমাসীরা চলে গেলেন। আমার বুড়ো দাদু, মাকে সুস্থ দেখে খুসী মনেই ফিরে গেলেন।

আলো নিভে গেল, বিলুমাসীকে আমি কি যে ভালবেসেছিলুম, যাকে ভালবেসে আমি অসীম সাহস পেয়েছিলুম সতত মৃত্যুকে, ভয়কে উপেক্ষা করতে।—কিন্তু আবার ঝ'ড়ো দিন এল কুটিল মেঘের অন্ধকারে দিনমান বিমর্ষ হল। আমার বাবা আরও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলেন, অতৃপ্ত বাসনায় তাঁকে কঠিন কুটিল মনে হল—আমার বেশ মনে পড়ে মার সঙ্গে যখন তিনি কথা কইতেন সহৃদয়তার লেশ মাত্রও থাকত না সে ভাষায়।

বহুকাল পরে সে সব কথা মনে করতে আমার আশ্চর্য লাগে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে কি এক অদ্ভুত অসহায় অদৃষ্টের তাড়না আমার বাবার আচরিত জীবনযাত্রাকে কেমন অবুঝ করে তুলেছেন। মানুষটাকে কি আমি আজও বুঝি, কখনও তাকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখেছি কখনও সে উন্মত্ত হয়ে প্রচণ্ড হিংসায় আমাকে প্রহারে প্রহারে জর্জ্জর করেছে। আমার মা আর চোখের জল ফেলেন না, একদিন সেইটেই ছিল তাঁর হৃদয়ের সব ব্যথার ফল্গু সব স্নেহের উৎস অসহায় বোবা পাথরের মত শান্ত হয়ে গেলেন তিনি

—বধির। কোনও বাদ প্রতিবাদ নেই, পৃথিবীর কোনও সাড়া পৌছয় না তাঁর কানে সন্ধ্যাতে নির্ব্বাক নীল আকাশের মত বেদনার রহস্যে মা যেন আমার থেকে দূরে দূরতর দ্বীপের মত জেগে রইলেন। বাবার ভয়ে আমি আর কতটুকু তাঁর কাছে যেতে পেতুম—রাত্রে একরাশ বুনো ত্রাস নিয়ে একলা পাখীর মত অন্ধকারে মুখ গুঁজে মরে থাকতাম যেন। একলা—।

তারপর একদিন অনিবার্য সেই মৃত্যু এল—যে মৃত্যুকে রক্ত পোষাকে রোজ রাতে আমি হেঁটে যেতে দেখেছিলাম—পৃথিবীর নীল ঘুমবিস্ফার দুটো চোখ—দুর্ব্বোধ্য এক স্বপ্নের মত।

আশ্চর্য—যে রাতে মার মৃত্যু হ'ল আমি একটুও ভয় পেলুম না, সেদিন মনে হল শরতের আকাশে ফালি ফালি মেঘের দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় তার শয়ন পাতা হয়েছিল, অন্ধকারে দূর হতে দূরতরে নীল নির্জ্জনে অন্য এক জীবনের অবাক বিস্ময়ে তিনি যেন হেঁটে চলে গেছেন। সেদিন আমাকে কাঁদতে না দেখে সবাই অবাক হল বিস্ময়ে।

স্বস্তি হল। মা আমার মরে জুড়োলেন। কাহিনীর প্রবর্তনা যাঁকে নিয়ে যিনি আমার বাবা সে মানুষটি অতঃপর সহজ হয়ে এলেন, একদিন তিনিই আমাকে নিয়ে এসে উঠলেন দাদুর কাছে আমি সে বার স্কুল পরীক্ষা দিয়েছি।

কলকাতার কলেজ আমাকে অন্য জীবনের স্বাদ দিলে। বাবা চলে গেলেন, রেখে গেলেন আমাকে আর আমার মার মুখ নিয়ে অশেষ বেদনার এক কৈশোর পীড়া। ভয়, ঘৃণা আর স্বস্তি আমাকে পৃথিবীকে নূতন করে চিনিয়ে দিলে। পুরাণো দিনগুলো সহজেই ভুলে গিয়েছিলাম—কলকাতায় তখন ঝড়ো দিনের হাওয়া

লেগেছে,—ইংরাজ শাসন অবসানের জন্যে অপেক্ষা করেছিল এক অভাবিত বিপ্লবের প্রস্তুতি, তারই কিছু এসে পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। এমনি দিনে আমরা পুঁথি ফেলে বিপ্লবী দলের খসড়া বইলুম, সেইসব ভয়ঙ্কর ত্যাগী নেতাদের সাহসী চোখের আগুন এসে আমাদের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

কখনও বাড়ী ফিরি কখনও বহুদিন ফিরিনে। আমার জন্যে বুড়ো দাদুর স্নেহ উৎপীড়িত হয়েছিল তাই। তারপর তিনিও গত হলেন। আমিও সম্পূর্ণ গৃহটান মুক্ত হলুম—মুক্ত সকল দায় দায়িত্ব। ইতিমধ্যে আমার একমাত্র বন্ধু স্বজন, যে আমাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে আমার কৈশোরের রক্তক্ষরা এক বেদনাকে জুড়িয়েছিল সেই বিলু-মাসীরও বিয়ে হয়েছিল।

বিলুমাসীর বিয়ে হয়েছিল এক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে—বিলু-মাসীর যিনি স্বামী হলেন তাঁর প্রতি প্রথম দর্শনেই আমি বিদ্বিষ্ট হয়েছি আর সেই বিদ্বেষ ততোধিক ঘৃণার সঞ্চার করলে আমার মনে যেহেতু তিনি ইংরাজের প্রহরী ছিলেন।

বিলুমাসীর বিয়ের রাতে অভিমানে চাপা কান্নায় আমার বুক ভেঙে যেতে লাগল। ওকে ডেকে বললাম,—বিলুমাসী তুমি যে এমনভাবে পর হয়ে যাবে এ আমি ভাবনি—তুমি কী আমাকে ভালবাসনা?

—পর কেন হ'বরে?—বিলুমাসী বলেছিলেন, তাঁর চোখে আলো কাঁপল; আমাকে বুকে টেনে নিলেন তিনি।

—পুলিশ বলেই তোমার স্বামীকে আমি ক্ষমা করতে পারবনা,—বলেছিলাম।

—পুলিশে তো সবাই মন্দ নয়, বোকা ছেলে, বিলুমাসী বলে ছিলেন। তবুও তার চোখের জল মুছতে হয়েছে।

—সমস্তক্ষণ বিদায়ের আগে সমস্তক্ষণ তিনি কাঁদলেন।

বিলুমাসীর চোখের জলে আমার আকুলতা আরও বাড়ল। বিলুমাসীকে আমি ভালবেসেছি, বিলুমাসীর চোখে আমার মায়ের স্মৃতি বাসা বেঁধেছিল, একথা বিলুমাসী কি বুঝল না।

রোজ সূর্যোদয়ে একলা নিরবয়ব বোধে আমার আকুলতা আরও তীব্র হয়, হাজার মানুষের মুখের ভীড়ে আমি একটি মুখ খুঁজি—যে মুখ আমার মায়ের স্নেহে উজ্জ্বল, যে চোখের আলো আমার চোখে আলো দিয়েছে যার মুখের ভাষা আমাকে কথা বলিয়েছে। এমনি দিন সাঙ্গের একলা নদীর মত লীন হয়ে গেল আমার সকল কাহিনী দূরাগত এক উৎসের বেদনায়।

একদিন গঙ্গার ধারে বসে ছিলাম, সঙ্গে বিপ্লবী দলের সাই-ক্লোস্টাইলে লেখা কিছু নথিপত্র নিয়ে অন্য এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছি।

চমকে উঠলাম—ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কেল্লার প্রান্ত থেকে কে একজন এগিয়ে আসছিল—কে যেন ঠিক আমার মায়েরই মত মুখ মায়ের মত চোখ তার। উঠে পড়েছিলাম—প্রায় ছুটে গেলাম।

—বিলুমাসী, তুমি এখানে?

—ওঁর সঙ্গে কেল্লায় এসেছিলাম, একলা ফিরছি।

—একলা কেন?

—উত্তর দিলেনা, দেখলাম নীল হয়ে উঠল মুখ।

—চুপ করলে যে?

—আমি সত্যিই তোমার পর হয়েছি সমস্ত দেশ ও সমাজ থেকেও, আমি পর ; একটু চুপ করে বললে জান আমিও ওঁকে ঘৃণা করতে শুরু করেছি। এখুনি সে বিপ্লবীদের কাউকে দেখতে পেয়ে খবর দিতে গেল। বাধা দিতে পারলুম না। আত্মগ্লানিতে মলিন বিলু-মাসির মুখ, ঘৃণায় নিস্পন্দ।

বুকটা কেঁপে উঠল, যদি ধরা পড়ে যাই তবে আমার কাছে নথি থেকে দলের অনেকের নাম পাবে ওরা। তবু উপস্থিত বুদ্ধি এল, বললাম—চল আমিই তোমাকে পৌছেদি'।

সেদিন বিলুমাসী আমাকে ছেড়ে দিলেন না—বললেন কী যে হয়েছিস, কোথায় থাকিস কি করিস, হাত ধরে টেনে নিয়ে বসিয়ে মাথার চুলগুলি আঙ্গুল চালিয়ে বিন্যাস আনলেন আমার রুক্ষ চুলের কী চেহারার ছিরি হয়েছে তোর ; খাস কিছু, নাকি শুকিয়ে থাকিস ?

প্রশ্ন আর প্রশ্ন—স্নেহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিলুমাসীর আবেগ।

বললাম—এখন যাই।

—না তোমাকে নয়, ইচ্ছে হচ্ছে তোমার স্বামী নামক জানোয়ার-টির অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিয়ে দি।

মাথা নামিয়ে ছিলেন বিলুমাসী বললেন,—হবে তা হবেও বা ওরা একদিন ওর অপরাধের শোধ নেবে। ও যেন মানুষ নয়, ও যেন কোন আইনের ক্রীতদাস।

চোখে জল উজ্জ্বল হল বিলুমাসীর—আহা মরে যাই এইসব সোণার ছেলেরা কি নির্যাতন না সইছে, জানি তো শুনি তো সব। শুনি কোমড়ে দড়ি বেঁধে অন্ধকার ঘরে দিনের পরদিন হাঁটিয়ে নিয়ে এসে, নাকে পিন ফুটিয়ে বরফে বসিয়ে কথা আদায় করে নাকি।

শুনেছি, আরো মারধোর জেল আটক ফাঁসির কথা। এসব যখন ভাবি তখন ভাবি ছুটে বেরিয়ে যাই, অনেকদূরে এ লোকটার পাপ সঙ্গ থেকে অনেকদূরে,—কিন্তু কোথায় যাব ?

একটা বিষের বেদনায় বিলুমাসীর মুখ নীল হয়ে উঠেছিল।

আর একবার আমার মার কথা মনে পড়ছিল আর আমার বাবার সেই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর হিংসুক চোখ যে চোখের দৃষ্টি আমার মার সুন্দর মুখে অসুখের কালি লেপে দিয়েছিল ত্রাসে, তা'র কাল একরাশ চুল পাটের মতো সাদা হয়েছিল, সে দৃষ্টি হিংস্র শ্বাপদের মত মাকে আমার মৃত্যুর নৃশংস অন্ধকারের বিবরে টেনে নিয়েছিল

বিলুমাসী খাবার দিয়েছিলেন, বসে আমাকে হাওয়া দিচ্ছিলেন। বলছিলেন—খাচ্ছিস না কিছু কি ভাবছিস ?

ভাবছিলুম আমি আমার বাবাকে কি প্রকার ঘৃণা করেছি, ভয় করেছি কিন্তু তিনি সেই মুহূর্ত্তে আমার সামনে এলে নিশ্চিত সেদিন গুলী করে মারতুম তাঁকে, নিশ্চয় মারতুম।

আর একদিন এই বিলুমাসীর মুখের দিকে তাকিয়েই আমার যেন দুর্জ্জয় সাহস হয়েছিল, এই সেই মুখ যাকে আমি ভাল বেসেছি, এই সেই যারী মার মমতা আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে আছে। চিৎকার করে বলে উঠলুম একটা রুদ্ধরোষ আর আহত কান্নায় হয়তো অদ্ভুত শোনাল আমার কথা, বলে উঠলুম—বিলুমাসী আমি তোমাকে ভাল বেসেছি, আমি তোমাকে এমনভাবে সরতে দেবনা, আমি তোমাকে ছিনিয়ে নেব। চল তুমি আমার সঙ্গে চল—অনেক বড় জীবনের সাধ যেখানে—যেখানে ভয় নেই মানা নেই।

আমার কথায় বিলুমাসী একটুও অবাক হলেন না—বললেন, কিছুই করার নেইরে বোকা ছেলে কিছু না। বিলুমাসীর চোখেও

এক নদী জল। খাওয়া ফেলে উঠেছিলাম, বিছানায় এসে বসলাম। বিলুমাসী বললেন—আজ আর তোর যাওয়া হবেনা। একটু হাসলেন তেমনি পাগল তুই, তেমনি আছিস।

আমার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন, আমাকে বুকে টেনে চুমা দিলেন! সঙ্গে আমার বিপ্লবী দলের নথিপত্র, ভাবলাম এসব নিয়ে তখন পথে না বেরুনোই ভাল। রাজী হয়ে গেলাম থাকতে। রাত হয়েছিল। একথা সে কথায় রাত্রি গভীর হল, বিলুমাসীর স্বামী তখনও ফেরেন নি।

বিলুমাসী বললেন—তুমি ঘুমিয়ে পড়। ঘুম আমার হবেনা। বললাম—বিলুমাসী তুমি কি জান, তোমার স্বামী আমাকেই আজ রাতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, নথীগুলো দেখিয়ে বললাম, এগুলো আমার জীবনের চেয়েও মূল্যবান এগুলোর খোঁজ পড়েছে যে।

বিলুমাসী আরেকবার চমকালেন, বললেন—ওগুলো আমার কাছে রাখ, ভয় নেই তোমার, ওকে বুঝিয়ে বলব অতিথির ক্ষতি করলে ভয়ানক পাপ হবে আর এমন নিরাপদ জায়গা তুমি কোথাও পাবেনা, পুলিশের বাড়ীর মতো নিরাপদ।

আমি বললাম কিন্তু সেই অতিথি যদি ভীষণ শত্রু হয়, সে শত্রু যদি পোষা সাপের মতন ছুবলে দেয়, হাসতে হাসতে বলছিলাম। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল।

বিলুমাসী বললেন—ও আসছে, আমি যাই তুমি ঘুমোও। যাবার আগে মশারী ফেললেন, নিচু হয়ে আমার কপালে আর একটি চুমা দিলেন।

অন্ধকার ঘর। বিলুমাসীর চুলের মতো অন্ধকার আমার মনে আগুন ধরিয়ে দিলে।

বিলুমাসীর কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌছল, উত্তেজনার কাটা কাটা কথা—নীচ! নীচ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি আর তুমি যদি ওকে ধরিয়ে দাও তো—।

কিসের একটা ধস্তা ধস্তি হল, কি যেন আছড়ে পড়ল তার শব্দ কানে এল তারপর সব চুপ।

উত্তেজনায় আমি উঠে বসেছি, কাঁপছে আমার সমস্ত শরীর বিলুমাসীকে কি ঠেলে ফেলে দিলেন ওঁর স্বামী, ওঁকে কি প্রহার করলে পশু। রাগে ঘৃণায় অন্ধকারে আমার চোখ জ্বলে উঠল।

প্রতিটি মূহুর্ত্ত যেন অনন্ত কাল মনে হল—নীরব অনন্ত বোবা কাল সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন অন্ধকারে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। আমিও স্তব্ধ সম্বিৎহান হয়েছিলাম কতক্ষণ জানিনা। উঠে পড়েছি। বিলুমাসীর ঘরের দরোজা খোলা, অন্ধকার। কোথা থেকে জানলা দিয়ে অল্প আলো এসে পড়েছে দেখলাম বিলুমাসীর পাশে তার স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। বিলুমাসী কি ঘুমিয়েছে জানিনা, অসহায় ভাগ্যের এক আত্মসমর্পিত বেদনায় লীন হয়ে আছে সে।

আমার বাবার কুটিল কঠিন মুখটা অট্টহাস্য করে উঠল আমার কানের কাছে তার প্রহারের চাবুকের শব্দ জেগে উঠল আমার পিঠে, আর আমার মায়ের সিঁথির সিন্দূর বিলুমাসীর কাল চুলের সিঁথিতে জেগে রইল নির্ব্বাক। ততক্ষণে আমার হাতের রিভলবারেরগুলি বিলুমাসীর স্বামীর বক্ষভেদ করে গর্জ্জে উঠেছে।

জর্ণাল

তারা ক'টি হয় রাস্তার ছেলে—একজন ছিল দোকানের পাশে, নীরবে দাঁড়িয়েছে না কাঁদছে, সে একটি মেয়ে।

আমি ওদের দেখছি—একতাল আমাদের বুকের ব্যথার মত অবজ্ঞাত এক নদীজলে কটি নাম না জানা ফুলের মত ভেসে এল যারা কাদায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। ফলন্ত কচি কটি বোঁটা ছেঁড়া ডাবের মত একত্রতায় হলুদ রোদের বিষন্নতায় বিপন্ন হয় না যে সকল মুখ, বয়সী পৃথিবীর মত বহুবার আকাশে অসংখ্য দৃষ্টি মেলেছে, তারা তো জানেনা কোথায় বড় দিনের আগুন জ্বলেছে, শিহরিত শীতের কান্নার মত স্থির পাপার্ত আবর্তে ওদের যন্ত্রনার অব্যক্ত বোঝা আমার পিছনে পিছনে হাঁটছিল—থমকে দাঁড়ালাম।

ওরা খড়কুটো জ্বেলে যেমনটি বসে থাকে—ময়লা শ্যাওলা মুখ আলোয় আগুনে জ্বলজ্বলা গানের গমকের মত প্রতিবাদী। কুড়িয়ে পাওয়া সিগারেটে ফু টেনে নীল ধোঁয়া ওদের রুক্ষ চুলে সময়ের সবুজ ছায়া ফেলেছিল। লুব্ধ সহর প্রত্যন্তে এক চৌমাথায় পুলিশের লাল পাগড়ির পাহারা, পীত আলোর বাঁক ফেরা ট্রামের শব্দ দোকানীর সশব্দ সহৃদয়তা পথচারীর শত চিন্তাকে ছিদ্র করা এক আনুনাসিক কান্না আমাকে অলিভার টুইষ্টের আত্মাকে মনে করিয়ে দিলে—কেননা শীর্ণ সেই কিশোরীটি কাঁদছিল। ওকে দেখে মনে হবে বয়েস তার—দশ বা শত শতাব্দীর কান্নাকালের বয়েস নিয়ে সেই শীতে কাঁপা দিনাবসানের দুঃখ কাল সে।

আত্মস্থতা ভেঙ্গে যেতই তবে মৌচাকের মত ওরা আমাকে ঘিরে

ফেলেছিল কিনা—আরো কাছে থেকে তাই দেখছি। ওদের অনেক কথার গুঞ্জন ভেদ করে ওদিকে দেখলাম যেহেতু রাস্তাকুড়ের বাসিন্দে তারা, কষা মাংসের হোটেল ওয়ালা বড়ই দয়ালু হয়—যদ্যপি ভুক্তাবশিষ্ট আহা হোক তা হোক ওদেরই বেটে দিবিক্ রে—দিয়ে দিস ওদের গরীব বেচারা! বলেছিল সে। আর মাটির গ্লাসে কটি শুকনো হাড়ের গায়ে হলুদ ঝোলের স্বাদ নিয়ে যখন ওরা কলহ করলে হিংসুক হলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আঁচড়ে দিলে সবচেয়ে বেশী করে সেই মেয়েটিকে মারলে অপিচ নির্দ্দয় হলেন। সেই হোটেলওলা। সে বা তার কর্ম্মী কেউ যদ্যপি বললে ভাগ্ রে শালা লোগ ভাগ! বেইমান। অতঃপর মাথা নিচু করে দোকানী নোট গুনলে—নোমস্কার—বললে সে খরিদ্দারকে। সে পঞ্চনদের অধিবাসী—সে হয় পাঞ্জাবী এবং দয়ালু এবং চৌমাথার হোটেলটার মালিক কেননা সে ঝোল মাখান শুকনো হাড় বেটে দিয়েছিল হতভাগ্য সেই ছেলেকটিকে।

অতঃপর শুকনো হাড়ের মাটির গেলাস কঠিন এসফালটামে পড়ে টুকরো টুকরো হল—সবকটি মুখ হা করে দেখলে তাই। মনে হল সেই ছোট্ট মেয়েটির শুভ্র কান্নার কটা এলমেল পাঁপড়ি একস্রোত ক্ষুধার জলে ডাঙা পাচ্ছেনা—ঢেউ উঠছে কোথায় কোথাও তখন বোবা অন্ধকারে সর্ব্বনাশী চুল এলান—থর থর করে কাঁপছে নীল নীল বিস্ময় চোখের তারায়, বড়দিনের শীত মাখানো আকাশে আগুনের গোলার মত হেঁকে উঠেছে গোল চাঁদ। ঠাণ্ডা শিশির ভেজা চাঁদোয়ায় হৈ হৈ করে উঠেছে রুদ্ধ ক্রোধ—আর এক মুঠো উত্তুরে হাওয়ার ঘূর্ণি জ্বলন্ত খড়কুটোগুলিকে উস্কে দিলে—নিভিয়ে দিলে নিভিয়ে দিলে ছড়িয়ে ছন্নছাড়া করলে।

এতাবত আমার ভাবনাকে ওরা মৌচাকের মধু ভেবেছিল আর

আমি গলান মোমের মত দলা বাঁধা। একটা হাত বাড়িয়ে বললে একজন—দুটা পয়সা দেবে (রুটি কিনে খাবো, কিংবা জমিয়ে রাখবো বা হারিয়ে ফেলবো, ছুনিগুলি কিনে জুয়া খেলবো, মাকে দেবো)।

—ওকে দিওনা, ও মুসলমান, ওর মা আছে।

—তাই বুঝি—আর ওর কেউ নেই বুঝি ?

মেয়েটির শুকনো হাতটায় রবারের লাল চুড়ি, চোখ দুটোতে দ্রাবিড় মেয়ের মমতা ছিল তাই তার দিকেই আমার হাতটা এগিয়ে গিয়েছিল। দুটো পয়সা ওকে দিতে চেষ্টা করছিলাম, অসম্ভব প্রতি-যোগী আরও কয়েকটি হাতকে স্তব্ধ করে শাপের ছোবলের মতন একটি কথা লিকলিক করে উঠল বিষকুম্ভের এক গোপন উদ্গারে সেই মুহূর্তের গলা টিপে ধরলে ওদেরই একজন যে বললে—ওকে দিওনা ওর মা বেস্‌সা।

প্রভূত আলো জ্বালান চৌরাস্তাটা যেন সত্যি নয়—বিপুল কলরব পথের, বিপনির বিকিকিনির পথিকের ব্যস্ততার—সংসারের বিবিধ আর সবকিছুকে দুটি পয়সার কল কোলাহল স্তব্ধ করে দিলে সেই মেয়েটির, দ্রাবিড় মেয়েটির আয়ত চোখে অনন্ত ঘুমের মিছিল ছিল—রক্তহীন মুখে লুপ্তপ্রায় সূর্যের অন্তিম প্রতীতির মত আরক্ত কিছু তার কপোলে জেগে উঠেছিল তদমুহূর্তে, তারপর সে নিভে গেল একরাশ লজ্জায় ভয়ে অপমানে।

পথচারীদের আর কারও দিকে ওদের প্রতিযোগী হাতগুলি এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওরা আবার ফিরে এসেছে, বসেছে খড়কুটো জ্বালান আগুন ঘিরে তদ্রূপ মিত্রতায় ওরা হেসে উঠলে ইতঃপূর্ব্বে যে একত্রতায় ওরা বনগড়া করেছে প্রতিযোগী হয়েছে সেইসব মারাত্মক মনুষ্য রচিত নাম রূপের ধারনায় যা মানুষকে ভয়ঙ্কর রূপে

অথবা নির্ধন ধনিকে নির্ম্মম দ্বন্দে অব্যহতি দেয় নি, আর গৃহহীন সেই মেয়েটির কুলশীলের লজ্জায় ওরা এক হয়ে গল্প করলে—সান্ত্বনা দিলে সেই কাঁদুনে মেয়েটিকে।

একজন—ধূলোট চুলে মুখ ঢাকা পড়েছিল যার—বলছিল—শালা বাড়ী যাবুনি আজ—তেই দশ আনা আনাজ কুড়িয়ে বেচনু।

রোগা বাঁশের মত সবুজ হাত বাড়িয়ে আর একটি মুখ দু'চোখে কাচের ধার নিয়ে বললে—দেখিরে আমার কাছে রাখ না।

—দেবনা শালা তোমার মামা তো সব লিয়ে লেয়, তার চেয়ে নক্ষীকে দেব। নক্ষা আর আমি ছিনেমা দেখব; পাহাড় পাখী আর সেই যে ছাহেবরে একটা—মনে নেই শালা?

ওরা হাতি বাগানের বড় বাড়ীটায় একবার ছিনেমা দেখেছে।

—দেখলুম আর দুজন সাথী দুটো হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নাচাচ্ছে লক্ষীর মুখের কাছে।

—লক্ষীর চোখ দুটোতে তখন উঁচু উঁচু পাহাড় সবুজ শন ছাওয়া বন বাদাড়ের অন্ধকার একটা টলটলে হ্রদের আয়নায় মেহগিনী আর বাদামের দূর বেদনার নীল ছায়া এক ফোঁটা জল হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল। ছেঁড়া ফ্রকটা বুকের কাছে তুলে ধরেছিল সে, তাতে রাখা কটা শুকনো মূলো। গুটি গুটি করে হাঁটছিল।

চৌমাথার লাল আলোর কাছে ও চলে এসেছে সেখানে কুয়াশা, সেখানে ভিজেট্রামের একটুক্ষণ স্তব্ধতা, রাস্তা ডিঙিয়ে গেল। রজনী-গন্ধা আর পদ্মফুল গুলির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, রাস্তার ফুলের দোকানের আর খেলনার সমস্ত রঙের মত নির্ব্বোধ সুন্দর কিছু যেমন আমাকে চমকে দেয় তেমনি হয়তো সে কিছু পেতে চাইলে, তারপর আবার স্থায়না হয়ে পথ হাঁটলে।

গঙ্গার পারে খালের ধারে ইমাল ডিমলি অন্ধকারে টেমি জ্বালান আলো পুড়ে পুড়ে অনেক কালি উগরে দিয়েছে। ধোঁয়ার মধ্যে নিচু নিচু খোলার ঘর একহাত পথের মুখোমুখি। নর্দমায় টেমির আলোতে সতর্ক ইঁদুরের চোখ চঞ্চল হয়েছে চলায়। অশরিরী কিছু যেন সেখানে জেগে আছে। লক্ষ্মী অন্ধকারে আমাকে দেখছে।

—তোমার মা?

সামনের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করলে। বললে—ভদ্রনোক দেখে পাইলে গেল।

কটি লোক অন্ধকারের দোসরের মত গলির শেষ মাথায় পৌঁছে গেল। ভাবছিলাম পালিয়ে গেল কেন?

—দরোজা ফাঁক করে একজন বললে কাকে খুঁজছ গা ছেলে। একজন বৃদ্ধার মুখ দেখতে পেলুম।

—লক্ষ্মীর মাকে?

—ওরে হতচ্ছাড়ী বলেছি যখন তখন বাড়ী আসবিনে, একটি যুবতী বেরিয়ে এসেছিল,—লক্ষ্মীকে সে নির্ম্মমভাবে মারলে। বাধা দিতে পারলাম না। বৃদ্ধা বললে—মারিস কেন লা ভাল করলে মানুষ নিয়ে এসে।

লক্ষ্মী এবার আর কাঁদলেনা। মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। টেমির আলোয় লক্ষ্মীর মার মুখখানা দেখছিলাম—ভাদ্রের গঙ্গার মত ঘোলাটে ফোলা ফোলা ঢেউয়ের মত তার মুখখানা, যার দেহে অনেক পঙ্কিল স্রোত নেমে ধুয়ে আমার অন্তরাত্মাকে কঠিন প্রশ্ন করলে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। বললে সে।

—পুলিশে কাজ করেন?

—না তো।

—পিছনে তাকিয়ে দেখলুম লক্ষ্মী নেই—অন্ধকারের সর্ব্বগ্রাসী ঢেউ তাকে অনেক দূর নিয়ে গেছে হয়তো চৌমাথায় সেই আগুন জ্বালান রাস্তাকুড়ের ছেলেদের আশ্রয়ে সে ফিরে গেছে যেখানে অনেক মার জমা হয়ে আছে সেইসব ছোট ছেলে মেয়েদের নীল মনে বড়দিনের শীত মাখানো আকাশে আগুনের গোলার মত হেঁকে উঠেছে একলা চাঁদ সেখানে রুদ্ধ ক্রোধে।